

পরিবেশ প্রসঙ্গ

প্রথম খণ্ড

কল্যানী বিশ্ববিদ্যালয়
পরিবেশ সচেতন কেন্দ্র
কল্যানী

2000

পরিবেশ প্রসঙ্গ

॥ প্রথম খণ্ড ॥

সম্পাদক
শ্যামাপদ সেন

কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়
পরিবেশ সচেতন কেন্দ্র, কল্যাণী

পরিবেশ প্রসঙ্গ

প্রথম খণ্ড

প্রথম মুদ্রণ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯০।

মূল্য—ত্রিশ টাকা।

সম্পাদক : অধ্যাপক শ্যামাপদ সেন।

কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশন সংস্থার পক্ষে ডঃ অসিত গুহ ও
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় পরিবেশ সচেতন কেন্দ্রের পক্ষে
শ্রীউৎপল কুমার সরকার দ্বারা প্রকাশিত।

বিশ্বাস প্রিন্টার্স (হালিসহর, উত্তর ২৪ পরগণা)—এর মুদ্রণযন্ত্রে
দিলীপ বিশ্বাস দ্বারা মুদ্রিত।

প্রাপ্তিস্থান : প্রকাশন সংস্থা, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়,
কল্যাণী-৭৪১২৩৫, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ।

সূচীপত্র

লেখক পরিচিতি

ডঃ কল্যাণ কুমার দাশগুপ্ত	উপাচার্য, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়
ডঃ দেবাশিষ দাস	অধ্যাপক, বাস্তুবিদ্যা বিভাগ
ডঃ দিলীপ কুমার খাঁ	অধ্যাপক, বাস্তুবিদ্যা বিভাগ
ডঃ সুভাষ চন্দ্র সাঁতরা	অধ্যাপক, বাস্তুবিদ্যা বিভাগ
ডঃ রুদ্রদেব বন্দ্যোপাধ্যায়	অধ্যাপক, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা বিভাগ
ডঃ সুশীলকান্ত কোনার	অধ্যাপক, প্রাণিবিদ্যা বিভাগ
ডঃ কনকরঞ্জন সমাদ্দার	অধ্যাপক, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা বিভাগ
শ্রীশঙ্কর নারায়ণ সিন্‌হা	গবেষক, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা বিভাগ
ডঃ শ্যামাপদ সেন	অধ্যাপক, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা বিভাগ
ডঃ মণীন্দ্র নারায়ণ মজুমদার	অধ্যাপক, রসায়ন বিভাগ
ডঃ দেবাশিস্‌ চট্টোপাধ্যায়	অধ্যাপক, রসায়ন বিভাগ
শ্রীরঞ্জন রায়	উন্নয়ন আধিকারিক
শ্রীউৎপল সরকার	সম্পাদক, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় পরিবেশ সচেতন কেন্দ্র, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

□

॥ মুখবন্ধ ॥

পরিবেশবিজ্ঞান আধুনিক বিজ্ঞানের নবীনতম শাখা, যদিও পরিবেশ সংরক্ষণের প্রয়োজনীতা অতি প্রাচীনকাল থেকেই স্বীকৃত। মানবজাতির ভবিষ্যৎ আজ পরিবেশের যথার্থ মূল্যায়ন, সীমিত ব্যবহার ও যথাযথ সংরক্ষণের উপর নির্ভরশীল। গত তিনদশকে পরিবেশ নিয়ে যত আলোচনা হয়েছে অন্য কোন বিষয়ে হয়ত এত আলোচনা হয়নি, যার সাথে সাধারণ মানুষ ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

কিন্তু পরিবেশ কি, কেন পরিবেশ সংরক্ষণের প্রয়োজন, সে সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের ধারণা খুবই অস্পষ্ট। "কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় পরিবেশ সচেতন কেন্দ্র" ব্রত নিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলের সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে ছাত্র-ছাত্রীদের, যারা দেশের ভবিষ্যৎ নাগরিক, তাদের এ বিষয়ে সচেতন করে তোলার। তাঁরা যে কর্মসূচী নিয়েছেন, তার একটি প্রধান অংশ হল, পরিবেশ সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতা ও আলোচনাচক্রের মাধ্যমে এই সচেতনতার চেষ্টা করা। ১৯৮৮-৮৯ সালে যে সব বক্তৃতামালার আয়োজন এঁরা করেছেন, এই গ্রন্থে তারই কয়েকটি ও অন্য দুটি প্রবন্ধ মুদ্রিত হ'ল। লেখকেরা সকলেই এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, গবেষক অথবা কর্মী। মোট বারোটি রচনা এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। পরবর্তী খণ্ডগুলিতে অন্যান্য বিষয়ে আলোচনা থাকবে। শেষ অধ্যায়ে কল্যাণী পরিবেশ সচেতন কেন্দ্রের সম্পাদক শ্রীউৎপল সরকার কেন্দ্রের কার্যাবলী ও কর্মসূচীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়েছেন।

পরিবেশ মানুষের জীবনধারণ ও সভ্যতার, সমৃদ্ধ হলেও সীমিত ভাণ্ডার। এই সম্পদগুলি কি, কোন্‌গুলি সৃজনশীল ও পুনব্যর্বহার-

যোগ্য, কিভাবে এই সম্পদ নিঃশেষ হচ্ছে, কোন্‌টির সংকটসময় আসন্ন, এই বিষয়ে আলোচনা করেছেন অধ্যাপক দেবাশিষ দাস, দিলীপ কুমার খাঁ, সুভাষ চন্দ্র সাঁতরা, রুদ্রদেব বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুশীলকান্ত কোনার। কিভাবে আমাদের নিত্যব্যবহার্য জল, বায়ু ও মৃত্তিকা দূষিত হচ্ছে সে দিকে আলোকপাত করেছেন এঁদের অধিকাংশই এবং অধ্যাপক কনকরঞ্জন সমাদ্দার, শ্যামাপদ সেন, দেবাশিস চট্টোপাধ্যায়, মণীন্দ্র নারায়ণ মজুমদার, শ্রীশঙ্কর নারায়ণ সিন্‌হা ও শ্রীরঞ্জন রায়। সভ্যতার প্রগতির জন্য অবশ্যপ্রয়োজন পরিবহণ ব্যবস্থা কিভাবে নানা পরিবেশ সমস্যার সৃষ্টি করেছে অধ্যাপক মণীন্দ্র নারায়ণ মজুমদারের আলোচনার সেটাই মুখ্য উপজীব্য বিষয়।

সভ্যতার বিকাশ ও শিল্পবিপ্লব কিভাবে মানুষকেও পণ্য করেছে, মানুষের সম্পর্ক তিক্ত ও বিষাক্ত করেছে, কিভাবে প্রকৃতির ক্রোড় থেকে মানুষ বিচ্ছিন্ন হয়েছে, শ্রীরঞ্জন রায় সে বিষয়ে আলোচনা করেছেন। মানুষের সীমাহীন লালসা প্রকৃতিকে দোহন করেই ক্ষান্ত হয়নি, বিবর্তনের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষের হৃদয়বৃত্তিকেও হত্যা করার চেষ্টা ক'রে মানুষের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবন দূষিত করেছে—যা পরিবেশ দূষণের এক অন্তিম দিক্।

গ্রথিত রচনাগুলির একটি বৈশিষ্ঠ্য হল প্রায় প্রত্যেক লেখকই শুধু সমস্যার তালিকা দিয়েই ক্ষান্ত হন নি, সমাধানেরও প্রচুর ইঙ্গিত দিয়েছেন। বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের যাঁরা কর্ণধার, তাঁরা কয়েকটি মূল্যবান্ প্রস্তাব ত পাবেনই, সাধারণ মানুষও তাঁদের সীমিত ক্ষমতা, প্রচেষ্টা ও শুভেচ্ছা দিয়ে কি ক'রে পরিবেশ সংরক্ষণ ও দূষণ প্রতিরোধে মূল্যবান সাহায্য করতে পারেন, যদি আর কেউ এগিয়ে না-ও আসে, সে সম্বন্ধে বেশ কিছু উপদেশ সংগ্রহ করতে পারবেন।

এই ধরণের রচনা সংগ্রহে কয়েকটি বিষয়ের পুনরাবৃত্তি অনিবার্য। এই পুনরুল্লেখ বিষয়গুলির গুরুত্বই সূচনা করে।

এই ক্ষুদ্র গ্রন্থটিকে দিবালোকে আনার মূল কৃতিত্ব, কল্যাণী পরিবেশ সচেতন কেন্দ্রের ডঃ অসিত গুহ এবং সম্পাদক শ্রীউৎপল সরকারের। উপাচার্য ডঃ কল্যাণ কুমার দাশগুপ্ত শুধু মূল্যবান্ একটি প্রবন্ধই উপহার দেন নি, পুস্তকটির প্রকাশে প্রচুর উৎসাহ ও অর্থসাহায্য করেছেন। লেখকদের কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি তাঁদের মূল্যবান্ রচনাগুলির জন্য এবং প্রচ্ছদটি অঙ্কনের জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি ইউনিভার্সিটি এক্সপেরিমেণ্টাল স্কুলের অঙ্কনশিক্ষক শ্রীঅনুপ মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে। মুদ্রাকর শ্রীদিলীপ বিশ্বাস পুস্তকটি মুদ্রণে যে সহযোগিতা করেছেন, তার জন্য তাঁকে সাধুবাদ জানাচ্ছি। অনিচ্ছাসত্ত্বেও বেশ কিছু ভুল থেকে গিয়েছে, সে জন্য সহৃদয় পাঠকের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। পরিশেষে যাঁদের জন্য এই আয়োজন, তাঁরা যদি কিছুটাও উপকৃত হন, এই পুস্তক প্রকাশের প্রচেষ্টা সার্থক হবে।

□

পরিবেশ প্রসঙ্গে

কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত

আমি যেখানে থাকি যাদের সঙ্গে থাকি আমার সেই বাসভূমি এবং সঙ্গী-প্রতিবেশী সম্পর্কে আমার সচেতনতার আর এক নাম পরিবেশ-সচেতনতা। বিষয়টাকে একটু বিশদ করা যাক। আমি যেখানে থাকব, আমার সেই বাসস্থান যথার্থই হবে বাসযোগ্য, সেখানে আলো-হাওয়ার স্বচ্ছন্দ প্রবেশাধিকার থাকবে, আর আমার পরিবারের মানুষজন ও পাড়াপ্রতিবেশীদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক হবে সহজ ও হার্দিক ; আমার সঙ্গী প্রতিবেশীরা মনুষ্যেতরও হতে পারে, যে-পাখি আমাকে রোজ গান শুনিয়ে যাচ্ছে, যে-প্রজাপতি আমার দৃষ্টিকে প্রীত করছে, যে-পোষা কুকুরটি আমার পায়ের কাছে বসে থাকে, যে-গরুটি দুগ্ধ-দানে আমার পুষ্টি সাধন করছে তাদের সঙ্গেও আমি কৃতজ্ঞ সম্বন্ধে আবদ্ধ। অর্থাৎ প্রতিদিনের এই-আমি, 'মানুষ' নামে প্রাণিজগতের উজ্জ্বলতম সমাজের সদস্য, নানাভাবেই প্রতিদিন প্রতিনিয়ত প্রকৃতি ও জীবজগতের সঙ্গে আদানপ্রদানের দৃশ্য-অদৃশ্য যোগসূত্রে জড়িত। কবির চোখে সে সম্পর্ক একরকমভাবে ধরা পড়ে, বিজ্ঞানীর চোখে আর-একরকম ভাবে। দীর্ঘ জীবনের শেষ প্রান্তে কবি আবিষ্কার করেন : আমার দুয়ারে আঙিনার ধারে ঐ চামেলির লতা, কোনো দুর্দিনে করে নাই কৃপণতা ; বিজ্ঞানী বলেন : নির্বিচার অরণ্যবিনাশ মানুষের জীবনে দারুণ বিপর্যয় ডেকে আনবে।

সার কথা তাহলে দাঁড়াচ্ছে, কোন মানুষই একলা নয়, সংসার-ত্যাগী ঋষিও নন, ঋষির সঙ্গী অরণ্যবাসী পশুপাখি, ঋষির আহার্য-পানীয়ের জন্য আছে ফলের গাছ, জলের ঝর্ণা। মানুষের সঙ্গে প্রকৃতি ও জীব-জগতের এই প্রতিদিনের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার অধ্যয়ন-গবেষণা পরিবেশ বিজ্ঞান, ইংরেজী 'ইকোলজিক্যাল স্টাডিজ' বা 'এন্‌ভাইরোন্‌মেন্টাল সায়েন্স'-এর উপজীব্য। এই বিজ্ঞান পরিবেশ প্রসঙ্গে আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য বিষয় সচেতন করে তুলছে, কারণ পরিবেশের প্রতিকূল আচরণের, অন্যভাবে প্রাকৃতিক ভারসাম্য বিনষ্টির মধ্যে, মানুষের সমূহ বিপদ। অতএব আজকের পৃথিবীতে সর্বত্র পরিবেশ-বিজ্ঞানের গুরুত্ব পরিদৃশ্যমান।

ইকোলজি (জার্মান oekologie) শব্দটি প্রথম প্রয়োগ করে-ছিলেন জার্মান জীববিজ্ঞানী আর্নস্ট হেয়কেল, গত শতাব্দীর শেষ দিকে। প্রেরণা পেয়েছিলেন গ্রীক oekos থেকে, oekos অর্থ বাড়ি, বাসস্থল। তাঁর ভাষ্যে সপ্রাণ অপ্রাণ দুই ধরনের পরিবেশের সঙ্গেই প্রাণিজগতের সম্পর্ক উচ্চারিত। পরবর্তী কালে গ্রীক oekos শব্দটির বা 'নিবাস' অর্থটির ভিত্তিকে প্রশস্ত করে বলা হলো, মানুষ এবং পরিবেশের সামগ্রিক সম্পর্কই পরিবেশ-বিজ্ঞানীর অধ্যয়ন-আলোচনার অন্তর্ভুক্ত। অতএব পরিবেশ-বিজ্ঞান রচনার সাহয্যে অন্যান্য নানা বিদ্যা এগিয়ে এলো ; জীববিজ্ঞান, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা, ভূগোল শাস্ত্র, রসায়ন-বিজ্ঞান,—বলতে গেলে প্রায় কোন বিদ্যাই বাদ রইল না। যাই হোক, বর্তমান বিশ্বের বিভিন্ন উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে পরিবেশ-বিজ্ঞান ক্রমশঃ জনপ্রিয় ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দেখা দিচ্ছে, যদিও ছয়ের দশকের আগে স্বতন্ত্র ও সুনির্দিষ্ট বিষয় হিসাবে এর আত্মপ্রকাশ ঘটেনি।

আধুনিক পরিবেশ-বিজ্ঞানের মতো সুনির্দিষ্ট কোনো বিদ্যাতন্ত্র হয়তো অতীতে ছিল না, কিন্তু অতীতের বহু জাতির বহু মানুষই যে পরিবেশ-

সচেতন ছিলেন ইতিহাসে তার নজির আছে। গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টটল (৩৮৪-৩২২ খ্রীস্টপূর্বাব্দ)-এর সুহৃৎ থিওফেস্টাস মানুষের সঙ্গে পরিবেশের সম্বন্ধ নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করেছিলেন। এ দেশেও কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে (যার মূলাংশ খ্রীস্টপূর্ব চতুর্থ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের রচনা বলে অনুমান) জনস্বাস্থ্য বিঘ্নিত করে পরিবেশ দূষিত করলে অপরাধীর শাস্তিবিধানের নির্দেশ আছে। আমাদের পূর্বপুরুষরা মানুষের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের উপর বৃক্ষ-অরণ্যানীর প্রভাবের কথা জানতেন। খ্রীস্টীয় চতুর্থ-পঞ্চম শতকের কামসূত্রে (১.৩.১৬.) উল্লিখিত চৌষট্টি কলার অন্যতম ছিল বৃক্ষায়ুর্বেদ। উদ্যান বা আরাম নির্মাণ ও তার যথোপযুক্ত রক্ষণা-বেক্ষণ ছিল উত্তম দানশীল কর্ম, শুক্রনীতিসারে (এটি অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন হলেও এর বিষয়বস্তু প্রাচীন ঐতিহ্যভিত্তিক) গ্রামে আম কাঁঠাল জাতীয় গাছ ও অরণ্যাঞ্চলে বুনো গাছপালা লাগাবার জন্য রাজাকে নির্দেশ দেওয়া আছে। খ্রীস্টীয় দ্বিতীয় শতকের গোড়ার দিকে পশ্চিম ভারতের নহপান নামে এক বিদেশী রাজার জামাতা উষভদাতের (সংস্কৃত ঋষভদত্তের) একটি অভিলেখতে রাজার বা অভিজাত ও সম্পন্ন ব্যক্তিদের বাগবাগিচা সংরক্ষণের কথা আছে খ্রীস্টীয় ষষ্ঠ শতকের গোড়ার দিকে বরাহমিহির রচিত বিখ্যাত বৃহৎ-সংহিতা গ্রন্থে বাগান-সজ্জিত মাঠ-ময়দানে (ইংরেজী পার্ক) সমৃদ্ধ ছোট-বড় শহরের উল্লেখ মেলে।

প্রাচীন ভারতে শহর প্রসঙ্গেই মনে পড়ে প্রাচীনতম বড়ো দু'টি শহর হরপ্পা ও মহেঞ্জোদাড়োর কথা। হরপ্পীয় বা সিন্ধুসংস্কৃতি বা সিন্ধুসভ্যতা নামে পরিচিত এ দু'টি শহরের সংস্কৃতির অবক্ষয় ও পতনের একাধিক কারণের মধ্যে বন্যা, ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপ, খাদ্যশস্যের অপ্রতুলতা, জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক ভার-সাম্যের বিনাশ প্রভৃতিকে গণ্য করা হয়। আবহাওয়ায় শুষ্কতাপের প্রকোপ ও মরুভূমির আগ্রাসনকে মহেঞ্জোদাড়োর পতনের প্রধান কারণ বলে আধুনিক অনেক ঐতিহাসিকের অভিমত। কিন্তু এই

আবহাওয়ার পরিবর্তনে কী জ্বালানীর প্রয়োজনে নির্বিচার বৃক্ষচ্ছেদ অর্থাৎ অরণ্যধ্বংস কোন অংশ নিয়েছিল ? হতে পারে, কারণ আবহাওয়াবিদ্‌রা বলেন, দূর অতীতের নিম্নসিন্ধু অঞ্চল ও পশ্চিম রাজস্থানের জলবায়ু আজকের মতো শুকনো খটখটে ছিল না।

নিসর্গপ্রকৃতির সঙ্গেই জড়িয়ে আছে মনুষ্যেতর প্রাণিজগৎ, যার একাংশের সান্নিধ্যে আমাদের দৈনন্দিনের অবস্থান। গৃহপালিত ও আরণ্যক পশুপাখি বা মাছের মতো জলজ প্রাণিসম্পদের অস্তিত্ব যাতে সহজ ও অব্যাহত হতে পারে সেদিকেও আমাদের দৃষ্টি দেওয়া উচিত। বিভিন্ন সময়ে সিংহ বাঘ গণ্ডার হরিণ হাতি প্রভৃতিকে মানুষ নির্বিচারে শিকার করে এসেছে, কখনও আর্থিক প্রাপ্তির লোভে, কখনও সহজাত শিকার-লোলুপতার আনন্দে। তেমনি যে হারে মাছ খাদ্যের উপাদান হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে, সে হারে মাছের বংশবৃদ্ধির চেষ্টা করা হয়নি। এতে প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হয়েছে, অতীতে এবং বর্তমানেও, এখন এ ব্যাপারে সচেতনতা জাগছে, এটা সুখের কথা।

একদিকে নদ-নদী পাহাড়-পর্বত মরু-অরণ্য নিয়ে বিচিত্র বিশ্বপ্রকৃতি, অন্যদিকে মানুষ ও মনুষ্যেতর জীবজন্তু নিয়ে বিপুল প্রাণিসম্পদ —দুয়ের সমবায়ে সমাবেশে এই প্রতিদিনের প্রাণবন্ত বিশ্বভুবন। সামগ্রিকভাবে এই দুই অংশের মধ্যে আছে সহজ স্বাভাবিক সম্পর্ক, কিন্তু মানুষের তৈরী কৃত্রিমতা এই সম্পর্ককে নষ্ট করে। চূড়ান্ত ফল বিষময়। প্রকৃতি প্রকৃতির নিয়মে চলে, মানুষ মানুষের। নদী আপন বেগে পাড় ভেঙে বন্যা আনলে মানুষ তাকে নিয়ন্ত্রণ করবে, নদীর তাতে আপত্তি নেই, কিন্তু, কারখানার রাসায়নিক আবর্জনা ফেললে জনস্বাস্থ্যের বিপর্যয় ঘটিয়ে নদী বিদ্রোহ জানাবে। যে-বাতাস রোজ আমাদের বাঁচার অক্সিজেন দিচ্ছে, আমরা যদি তার কাজের পুরস্কার হিসাবে রাশি-রাশি বিষাক্ত মিথেন মনোকসাইড গ্যাস তাকে উপহার দিই, একদিন সে আমাদের ছেড়ে কথা বলবে না, আমাদের

দেবে মৃত্যুদণ্ড, প্রতিদিন প্রতিনিয়ত কুরে কুরে খাওয়ার মৃত্যু। আদিতে শব্দ কত মধুর কত গভীর, অথচ শব্দের অত্যাচার যে কী ভয়াবহ হতে পারে যানবাহনে আকীর্ণ লোকারণ্যের শহরে এলে, তা হাড়ে হাড়ে টের পাওয়া যায় এবং এই শব্দের ভয়াবহতা যে আজকের অনেকের বধিরতার মূলে এ খবর চিকিৎসাজগতের।

আসল কথা পরিবেশ দূষিত হচ্ছে, নানাভাবে, প্রতিদিন। আগের তুলনায় আমরা যথেষ্ট পরিবেশ-সচেতন হয়েছি, পরিবেশ-শুদ্ধির কথা বলছিও, কিন্তু আমাদের ভাবনা-চিন্তাকে কাজে পর্যাপ্ত-ভাবে রূপায়িত করতে পারছি না। দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। আমি সপ্তাহান্তে সপ্তাহাগ্রে কলকাতায় যাতায়াত করি। আসা-যাওয়ার পথে শতকরা নিরানব্বইটি ট্রাক ও বাসকে এবং কিছু কিছু প্রাইভেট গাড়িকেও বিষাক্ত গ্যাসীয় ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে ধাবমান দেখি। এদের বিরুদ্ধে কি আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া যায় না? যে সব কলকারখানা নদী-পুকুর-বিল নষ্ট করছে তাদের মালিকদের কি শাস্তি দেওয়া যায় না? হাসপাতালের পাশ দিয়ে যে-গাড়ির ড্রাইভার কর্ণবিদারী হর্ন বাজাতে বাজাতে চলে যায় তার লাইসেন্স কি খারিজ করা যায় না? এ তো গেল আইনের ব্যাপার। সরকার বুঝবেন, দেখবেন, যদিও বলতে বাধ্য হচ্ছি, সরকারী কাজকর্মেও এ ব্যাপারে বিস্তর শৈথিল্য। না হলে সরকারী পরিবহণ দপ্তর কী করে দিনের-পর দিন রাস্তায় ত্রুটিযুক্ত অসংখ্য বাস নামান যেগুলি প্রতিনিয়ত বিষাক্ত ধোঁয়া ছেড়ে জনস্বাস্থ্য বিঘ্নিত করছে? আমাদের সরকারী পরিবেশ দপ্তর কী পরিবহণ দপ্তরকে এ ব্যাপারে সজাগ করতে পারেন না? পরিবহণ দপ্তরের কর্মচারী ইউনিউয়নেরও কী এ ব্যাপারে কোন কিছু করণীয় নেই?

শুধু সরকারকে সব কিছু করতে বললে চলবে না। কারণ আমাদের নিয়েই তো সরকার। আমাদের কী কোন দায়িত্ব নেই? প্রতি-

নিয়ত পরিবেশকে যারা দূষিত করছে, সংঘবদ্ধভাবে আমরা কী তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারি না? ধরুন, যে-সব টেম্পো ট্রাক ও বাস মিথেন মনোক্সাইড ছাড়তে ছাড়তে পথ চলে, আমাদের তরুণ ও যুবক বন্ধুরা যদি তাদের পথ রোধ করে জরিমানা আদায় করতে শুরু করে অথবা যে-সব কলকারখানার দূষিত আবর্জনায় সমীপস্থ নদী-পুকুর-বিলের জল গরলিত হয় সেই সব কারখানার মালিকদের কাছ থেকেও যদি অনুরূপভাবে জরিমানা সংগ্রহে প্রবৃত্ত হয়, তবে প্রত্যাশিত ফল পেতে দেরি হবে না। অর্থাৎ যান্ত্রিক ত্রুটি সারাবার ব্যাপারে গাড়ির মালিকরা এবং দূষিত আবর্জনা অন্য ভাবে নষ্ট করার ব্যাপারে কারখানার মালিকরা সচেষ্ট হবেন, আমাদের নিঃশ্বাস নেওয়ার হাওয়া এবং নিত্য ব্যবহার্য জল দূষিত হবে না। পরিবেশ সংরক্ষণের প্রসঙ্গে এ দাওয়াইয়ের কথা মনে এলো পুজো এবং অন্যান্য উৎসব উপলক্ষে আমাদের উৎসাহী ছেলেদের চাঁদা সংগ্রহের অভিযানে। এই সব ছেলে, যাদের চাঁদা চাওয়ায় আমি দোষ দেখি না কিন্তু চাঁদার নামে অত্যাচারে আমি ক্ষুব্ধ হই, তারা কিন্তু পরিবেশ দূষণকারীদের জরিমানা থেকে অনেক বেশি টাকা পেতে পারে। এতে সমাজের লাভ। বাঙালী-অবাঙালী সাধারণ মধ্যবিত্ত মানুষ চাঁদার অত্যাচার থেকে বেঁচে যাবেন পূর্বোক্ত চাঁদা-প্রার্থীদেরও আর দরজায় দরজায় ঘুরতে হবে না, এবং সর্বোপরি আস্তে আস্তে পরিবেশ দূষণকারীরা স্বভাবী শৈথিল্য পরিত্যাগ করে কর্মধারা বদলে পরিবেশ রক্ষণে প্রয়াসী হবেন। অতএব আমরা প্রথম স্তরে প্রত্যেকে যদি ব্যক্তিগতভাবে এবং দ্বিতীয় স্তরে অঞ্চল-ও গোষ্ঠীগতভাবে আমাদের সাধ্যায়ত্ত পরিবেশ সংরক্ষণের দায়িত্বটুকু পালন করি, তাহলে আমরা আকাশভরা সূর্য-তারা বিশ্ব-ভরা প্রাণের মাঝখানে প্রাণবন্ত আনন্দে দীর্ঘ দিন বেঁচে থাকতে পারব।

□

বিশ্ব পরিবেশে খনিজ সম্পদ

দেবাশিষ দাস

সম্পদ বলতে ঠিক কোন বস্তু বা পদার্থকে বোঝানো হয় না। প্রকৃতপক্ষে সম্পদ কোন বস্তু বা পদার্থের কার্যকারিতাকে বোঝায়। আর একটু পরিষ্কার ভাবে বলতে গেলে এই কার্যকারিতা হচ্ছে মানুষের ব্যক্তিগত অথবা সামাজিক চাহিদা মোচন করা। মানুষের ব্যক্তিগত অথবা সামাজিক চাহিদা মেটানোর উদ্দেশ্যে কোন নির্দিষ্ট স্থানে এবং কালে কোন বস্তু বা পদার্থ যে কাজ করতে সক্ষম, প্রকৃত অর্থে সেই কাজকেই সম্পদ বলা হয়। সুতরাং কোন জিনিসকে সম্পদ হিসাবে গণ্য করতে গেলে প্রথমতঃ তার উপযোগিতা এবং দ্বিতীয়তঃ মানুষের অভাব মোচনের ক্ষেত্রে সেটার কার্যকারিতা থাকা প্রয়োজন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, বহু প্রাচীন কাল থেকেই কয়লা, তেল, তেজস্ক্রিয় খনিজ, ধাতব খনিজ ইত্যাদি ভূস্তরে স্বাভাবিক অবস্থায় ছিল। অতি প্রাচীনকালে মানুষ এই সকল খনিজ ব্যবহারের ব্যাপারে অজ্ঞ থাকায় এই সকল খনিজ সেই সময়ে সম্পদ রূপে গণ্য হয়নি।

সম্পদের শ্রেণীবিন্যাস

এই নিবন্ধে সম্পদের একটি দিক যথা প্রকৃতিতে সঞ্চিত সম্পদ তথা খনিজ সম্পদ ভাণ্ডার নিয়েই আলোচনা করা হবে। বস্তুতঃ প্রাকৃতিক সম্পদের সহজলভ্যতা ও প্রাচুর্য্যের

বিষয় চিন্তা করতে গেলে তাদের স্থায়িত্ব এবং ক্ষয়িষ্ণুতার বিষয়-টিও বিবেচনা করা প্রয়োজন। আর এই দিক থেকে বিচার করতে গেলে প্রাকৃতিক সম্পদকে তুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা— ১) প্রবহমান সম্পদ এবং ২) সঞ্চিত সম্পদ।

১ নং সারণি প্রবহমান ও সঞ্চিত সম্পদ

প্রবহমান সম্পদ		সঞ্চিত সম্পদ		
সংকটপূর্ণ অঞ্চল	অ-সংকটপূর্ণ অঞ্চল	ব্যবহার দ্বারা খরচ করা হয়	তাত্ত্বিক দিক থেকে আহরণ করা হয়	পুনর্ব্যবহার যোগ্য
মাছ	সৌর শক্তি	খনিজতেল	সমস্ত খনিজ মৌল	ধাতব খনিজ
বনাঞ্চল	বায়ু	খনিজ গ্যাস		
প্রাণীকুল	ঢেউ	কয়লা		
মৃত্তিকা	জল			
ভূ-জল	বাতাস			

উল্লিখিত সকলপ্রকার প্রাকৃতিক সম্পদের মধ্যে খনিজ সম্পদের প্রবাহ সর্ব্বদাই একমুখী। এই সম্পদের ক্রমাগত ব্যবহারের ফলে সম্পদের ভাণ্ডার কমে যাচ্ছে।

খনিজ দ্রব্যকে প্রধানতঃ তুই ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। যথা ঃ ১) ধাতব খনিজ এবং ২) অ-ধাতব খনিজ। এই তুই প্রকার খনিজ আবার কতগুলি বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত।

খনিজ সম্পদ

- ধাতব খনিজ
  - লৌহবর্গীয় ধাতব খনিজ
    যথা ঃ লৌহ
  - লৌহসঙকর ধাতব খনিজ
    যথা ঃ ম্যাঙ্গানিজ নিকেল, টাংস্টেন
  - অ-লৌহবর্গীয় ধাতব খনিজ
    যথা ঃ তাম্র, টিন, অ্যালুমিনিয়ম, দস্তা, সীসা প্রভৃতি এবং স্বর্ণ, রৌপ্য প্লাটিনাম প্রভৃতি মূল্যবান খনিজ।
- অ-ধাতব খনিজ
  - জ্বালানী খনিজ
    যথা ঃ কয়লা, খনিজ তেল, গ্যাস।
  - গৃহনির্মাণে ব্যবহৃত খনিজ
    যথা ঃ চুন চুনাপাথর, মার্বেল।
  - রসায়ন শিল্পে ব্যবহৃত খনিজ
    যথা ঃ লবণ, গন্ধক, পটাস, ডলোমাইট, চুনাপাথর প্রভৃতি।
  - অন্যান্য অ-ধাতব খনিজ
    যথা ঃ অভ্র, গ্রাফাইট প্রভৃতি।

সম্পদের আয়ুষ্কাল

ভূস্তরে যতটা পরিমাণ অ-জ্বালানী খনিজ বর্তমান (প্রতি মেট্রিক টন গ্রাম হিসাবে) তাকে ভূ-স্তরের মোট ওজন বা ভূস্তরে এক কিলোমিটার গভীর পর্যন্ত ওজন দ্বারা গুণ করলে "রিসোর্স বেস" বা সম্পদ মূল পাওয়া যায়। অবশ্য এইরূপ হিসাব করলে সম্পদের পরিমাণ প্রচুর দাঁড়ায়। প্রতি বৎসর ধাতব খনিজের খরচের পরিমাণ একই রকম থাকলে প্রায় সমস্ত খনিজেরই আয়ুষ্কাল বহু-বছর হতে পারে। কিন্তু এমনকি বাৎসরিক শতকরা ২ ভাগ চক্র বৃদ্ধি হারে খনিজের ব্যয় বাড়লে সাংঘাতিক ভাবে এই সম্পদের

আয়ুষ্কাল কমে যাবে এবং এই হার শতকরা দশভাগ হলে সমস্ত খনিজ সম্পদ আগামী ২৬০ বছরের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে। অবশ্য এই হিসাবে করা হয়েছে এটা ধরে যে কারিগরী উৎকর্ষ এমন একটা যায়গায় পৌঁছাবে যে সমস্ত খনিজ মৌলকে ভূ-স্তর থেকে অর্থ-নৈতিক দিক থেকে লাভজনক অবস্থায় আহরণ করা সম্ভব হবে। বাস্তবিক দিক থেকে এটা কতখানি সম্ভবপর হবে তা অবশ্য বলা মুশকিল।

কতিপয় খনিজ মৌলের সম্পদমূল (রিসোর্স বেস) ও আয়ুষ্কাল

খনিজ	সম্পদমূল* (মেট্রিক টন)	আয়ুস্কাল ও তৎসহ বিভিন্ন খরচ বৃদ্ধির হার +				বার্ষিক গড় বৃদ্ধি
		০	২%	৫%	১০%	১৯৪৭ ৭৪
অ্যালুমিনিয়ম	২×১০^{১৮}	১৬৬×১০^{৯}	১১০৭	৪৬৮	২৪৭	৯.৮
ক্যাডমিয়ম	৩.৬×১০^{১২}	২১০×১০^{৬}	৭৭১	৩৩২	১৭৭	৪.৭
ক্রোমিয়াম	২.৬×১০^{১৫}	১.৩×১০^{৯}	৮৬১	৩৬৮	১৯৬	৫ ৩
কোবাল্ট	৬০০০×১০^{১২}	২৩.৮×১০^{৯}	১০০৯	৪২৮	২২৭	৫.৮
তামা	১.৫×১০^{১৫}	২১৬×১০^{৬}	৭৭২	৩৩২	১৭৭	৪.৮
স্বর্ণ	৮৪×১০^{৯}	৬২.৮×১০^{৬}	৭০৯	৩০৭	১৬৪	২ ৪
লৌহ	১৪×১০^{১৮}	২.৬×১০^{৯}	৮৯৮	৩৮৩	২০৩	৭.০
সীসা	২৯০×১০^{১২}	৮৩.৫×১০^{৬}	৭২৪	৩১৩	১৬৭	৩.৪
ম্যাগনেসিয়াম	৬৭২×১০^{১৫}	১৩১.৫×১০^{৯}	১০৯৫	৪৬৩	২৪৪	৭ ৭

ম্যাঙ্গানিজ	৩১.২×১০^{১৫}	৩.১×১০^{৯}	৯০৬	৩৮৬	২০৫	৬.৫
পারদ	২.১×১০^{১২}	২২৩.৫×১০^{৬}	৭৭৩	৩৩৩	১৭৮	২.০
নিকেল	২.১×১০^{১২}	৩.২×১০^{৬}	৫৬৯	২৪৬	১৩৩	৬.৯
ফসফোরাস	২৮.৮×১০^{১৫}	১৯×১০^{৯}	৮৮১	৩৭৬	২০০	৭.৩
পটাসিয়ম	৪০৮×১০^{১৫}	২২.১×১০^{৯}	১০০৫	৪২৭	২২৬	৯.০
রৌপ্য	১.৮×১০^{১২}	১৯৪.২×১০^{৬}	৭৬৬	৩৩০	১৭৬	২.২
গন্ধক	৯.৬×১০^{১৫}	২০৫.৩×১০^{৬}	৭৬৯	৩৩১	১৭৭	৬.৭
টিন	৪০.৮×১০^{১২}	১৭২.২×১০^{৬}	৭৬০	৩২৭	১৭৫	২.৭
টাংস্টেন	২৬.৪×১০^{১২}	৬৭৭.২×১০^{৬}	৮২৯	৩৫৬	১৮৯	৩.৮
দস্তা	২২×১০^{১৫}	৩৯৮.৬×১০^{৯}	১১৫১	৪৮৬	২৫৬	৪.৭
প্লাটিনাম	১.১×১০^{১২}	৬.৭×১০^{৯}	৯৪৪	৪০২	২১৩	৯.৭

*সম্পদমূল হিসাবে করা হয় কোন মৌলের প্রাচুর্য্যকে (প্রতি মেট্রিক টনে গ্রাম হিসাবে) ভূ-স্তরের মোট ওজন (২৪×১০^{১৮}) দ্বারা গুণ করে।

+US Bureau of Mine, Commodity Data Summaries, 1972-6 ; and US Bureau of Mines, Minerals Year Book, 1974.

খনিজ পদার্থের উৎস গুলি তখনই ভাণ্ডার হিসাবে প্রমাণিত হবে যখন সেগুলি বাজারের চাহিদা, মূল্য ও প্রকৌশলগত দিক

থেকে অর্থনৈতিক ভাবে লাভজনক অবস্থায় উত্তোলন করা সম্ভব হবে।

খনিজ ভাণ্ডার অন্বেষণে সরকারি, এবং আন্তর্জাতিক স্তরে প্রচেষ্টা দেখা যায়। এই ব্যাপারে ভারতবর্ষ, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া ইত্যাদি দেশের সরকারের সরাসরি প্রচেষ্টা লক্ষণীয়। একই সাথে বিভিন্ন রাষ্ট্রে বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থাও এ-ব্যাপারে থেমে নেই।

পৃথিবীর লৌহ-আকরিক উত্তোলন ঃ ১৯৮৫

দেশ	উত্তোলন (কোটি মেট্রিক টন)	মোট উত্তোলনর শতকরা হার (%)
সোভিয়েত ইউনিয়ন	২৪.৭১	৩০.৬৬
চীন	১৩.১৫	১৬.৩২
অষ্ট্রেলিয়া	৯.১৩	১১.৩৩
ব্রেজিল	৬.৮২	৮.৪৬
আমেরিকাযুক্তরাষ্ট্র	৪.৯২	৬.১২
ভারত	৪.২৪	৫.২৬
কানাডা	৩ ৯৯	৪.৯৫
দক্ষিণ আফ্রিকা	২.৪৩	৩.০২
সুইডেন	১.৯৮	২.৪৬
ফ্রান্স	১.৪৭	১.৮৭
ভেনেজুয়েলা	১.৪৭	১.৮২
অন্যান্য	৪.৭৭	৫.১১
পৃথিবী	৮০.৬০	১০০.০০

U. N. Monthly Bulletin of Statistics, March 1987 হইতে সংগৃহীত।

পৃথিবীর খনিজ তাম্র উত্তোলন

দেশ	উত্তোলন (লক্ষ মেট্রিক টন)		মোট উত্তোলনের শতকরা হার (%)	
	১৯৮৫	১৯৮৪	১৯৮৫	১৯৮৪
সোভিয়েত ইউনিয়ন*	১৪.০০	১৪.০০	১৬.১২	১৬.১৩
চিলি	১৩.৫৭	১৩.০৬	১৫ ৬২	১৫.০৫
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র	১১.১১	১০.৮৭	১২.৭৯	১২.৫২
কানাডা	৭.২৪	৭.০৬	৮ ৩৩	৮ ৩৩
জাম্বিয়া	৫.৭০	৬.৩৩	৬ ৫৬	৭ ২৯
জাইর	৫.১৩	৫.০১	৫.৯০	৫.৭৭
অন্যান্য	৩০.১৩	৩০.৪৮	৩৪.৬৮	৩৫.১১
পৃথিবী	৮৬.৮৮	৮৬.৮১	১০০.০০	১০০ ০০

U. N. Monthly Bulletin of Statistics, March 1987 *১৯৮৩ খ্রীষ্টাব্দের উত্তোলন, Statistical Year-book/ 83-84 হইতে সংগৃহীত।

পৃথিবীর খনিজ সীসা উত্তোলন

দেশ	উত্তোলন (লক্ষ মেট্রিক টন)		মোট উত্তোলনের শতকরা হার (%)	
	১৯৮৬	১৯৮৫	১৯৮৬	১৯৮৫
সোভিয়েত ইউনিয়ন*	৭.৪৫	৭.৪৫	১৫.৬০	১৫.৫৯
অস্ট্রেলিয়া	৪.৭০	৪.৭৬	৯ ৮৪	৯.৯৬
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র	৩.৪৮	৪.০৯	৭.০৮	৮.৫৬
কানাডা	২.৯৬	২ ৮৫	৬.২০	৫.৯৭
পেরু	১.৯৩	২.১৩	৪.০৪	৪ ৪৬
মেক্সিকো	১.৮২	২.০৭	৩ ৮১	৪ ৩৩
যুগোশ্লভিয়া	১.১৬	১.১৫	২.৪৩	২.৪১
মরোক্কো	১.০২	১.০২	২.১৪	২.১৩
স্পেন	০ ৮০	০.৮৭	১ ৬৮	১.৮২
ভারত	০.৩৪	০.২৭	০.৭১	০.৫৭
অন্যান্য	২২.১৯	২১.১২	৪৬.৪৭	৪৪.২০
পৃথিবী	৪৭.৭৫	৪৭.৭৮	১০০.০০	১০০.০০

U. N. Monthly Bulletin of Statistics, October, 1981 হইতে সংগৃহীত।

পৃথিবীর খনিজ দস্তা উত্তোলন

দেশ	উত্তোলনের পরিমাণ		মোট উত্তোলনের শতকরা হার (%)	
	১৯৮৬	১৯৮৫	১৯৮৬	১৯৮৫
কানাডা	১২.৮৭	১১.৭২	২১.১০	১৯ ২৬
সোভিয়েত ইউনিয়ন	৯.৩০	৯.৩০	১৫.২৫	১৫ ২৯
অস্ট্রেলিয়া	৬.৯২	৭.২৭	১১.৩৫	১১.৯৫
পেরু	৫.৫৩	৫.৯৯	৯.০৭	১১ ৯৫
মেক্সিকো	২.৭০	২.৭৪	৪.৪৭	৯৮৫
স্পেন	২.২৮	২.২৮	৩ ৭৪	৪ ৫০
জাপান	২.২২	২.৬২	৩.৬৪	৩ ৭৫
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র	২.০১	২.১৮	৩ ২৯	৪ ৩১
আয়ারল্যাণ্ড	১.৮২	১.৯২	২ ৯৮	৩.৫৮
পঃ জার্মানী	১.০৪	১.১৮	১ ৭০	৩ ১৬
ভারত	০.৫৩	০.৫২	০ ৮৭	১.৯৪
অন্যান্য	১৩.৭৭	১৩.১২	২২ ৫৮	২১ ৫৬
পৃথিবী	৬০.৯৯	৬০.৮৪	১০০.০০	১০০.০০

শিলাস্তরের অভ্যন্তরে যে খনিজ তেল, গ্যাস ও কয়লা পাওয়া যায় পৃথিবীতে তার প্রাচুর্য সব যায়গায় একরকম নয়, ফলে এই তেল ও গ্যাসের উত্তোলন ও ব্যবহার নিয়ে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিধি-নিষেধও বর্তমান। কতটা খনিজ জ্বালানি ভূস্তরে বর্তমান তা সঠিক ভাবে নির্ণয় করা হয়ত অসুবিধা, তবে এই ব্যাপারে ভালো রকম একটা

আন্দাজ পাওয়া সম্ভব। খনিজ তেল উত্তোলনকারী অঞ্চলসমূহকে প্রধানতঃ চারটি বলয়ে ভাগ করা যায়। যথা ঃ ১) আমেরিকান বলয়—কানাডা, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো, ভেনেজুয়েলা, কলম্বিয়া, আর্জেন্টিনা। এই বলয় থেকে পৃথিবীর মোট তেল উত্তোলনের প্রায় দুই পঞ্চমাংশ উত্তোলিত হয়। ২) মধ্যপ্রাচ্য বলয়—এই বলয়ের মধ্যে দিয়ে ইরান, ইরাক, সৌদি আরব, কুয়েত, বাহারীন ও উত্তর আফ্রিকা পড়ে। ৩) পূর্ব ইউরোপের দেশ সমূহ—এদের মধ্যে রুমানিয়া এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন উল্লেখযোগ্য। মধ্য-প্রাচ্য ও পূর্ব ইউরোপ বলয় থেকে পৃথিবীর মোট তেল উত্তোলনের অর্দ্ধেকের বেশী তেল উত্তোলিত হয়। ৪) সুদূর প্রাচ্য বলয়—এদের মধ্যে পূর্ব এশিয়ার ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, ব্রহ্মদেশ, ইন্দোনেশিয়া ও সুদূর প্রাচ্যের জাপান, চীন, প্রভৃতি দেশ পড়ে। এই বলয় থেকে পৃথিবীর মোট তেল উৎপাদনের শতকরা প্রায় ৫ ভাগ উত্তোলিত হয়।

পৃথিবীর খনিজ তৈল উত্তোলন—১৯৮৬

দেশ	উত্তোলনের পরিমাণ (কোটি মেট্রিক টন)	মোট উত্তোলনের শতকরা হার (%)
সোভিয়েত ইউনিয়ন	৬১.৪৭	২২.২২
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র	৪৩.০৭	১৫.৫৭
সৌদি আরব	২৫.০২	৯.০৫
মেক্সিকো	১৩.৫৭	৪.৯১
চীন	১৩.০৩	৪.৭১
ব্রিটেন	১২.০৫	৪.৩৬
ভেনেজুয়েলা	৯.৪০	৩.৪০
ইরান	৯.২৭	৩.৩৫
ইরাক	৮.২৩	২.৯৭
নাইজেরিয়া	৭.২৮	২.৬৩

কানাডা	৭.২০	২.৬০
কুয়েত	৭.১১	২.৫৭
ইন্দোনেশিয়া*	৬.৫২	২.৩৬
সং আঃ আমীরশাহী	৫.৯৪	২.১৫
লিবিয়া	৪.৯৮	১.৮০
নরওয়ে	৪.১১	১.৪৮
মিশর	৪.০৯	১.৪৮
ভারত	৩.১২	১.১৩
অন্যান্য	৩১.১৪	১১.২৬
পৃথিবী	২৭৬.৬০	১০০.০০

*১৮৯৫ সালের উত্তোলন।

U. N Monthly Bulletin of Statistics, October 1987 হইতে সংগৃহীত।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রাকৃতিক তেল উৎপাদন একটা বিশেষ মাত্রা পায় সত্তরের দশকের প্রথমভাগে। এর ঠিক পূর্বেই ওপেক (OPEC) তেলের মূল্য বৃদ্ধি করে কারণ সেই সময়ের শিল্পোন্নত দেশগুলিতে তেলের চাহিদা বেড়ে যায়। বিশেষজ্ঞদের মত অনুযায়ী দেখা যায় যে বিশ্বে তেলের উৎপাদন নব্বুইয়ের দশকে চূড়ান্ত মাত্রা স্পর্শ করবে এবং তারপরই এই উৎপাদনের মাত্রা কমতে থাকবে। অদূর ভবিষ্যতে বিশ্বে তেল উৎপাদনের খরচ ক্রমশ বাড়তে থাকবে ফলে বহু ক্ষেত্রেই পেট্রোলিয়ম জাত দ্রব্যের ব্যবহার কমে আসবে বিশেষতঃ বিশ্বে যে সমস্ত দেশ তেলে সমৃদ্ধ নয় সেই সকল দেশগুলিতে। পারস্য উপসাগরীয় দেশসমূহঃ, মেক্সিকো, ইন্দোনেশিয়া ইত্যাদি তেল সমৃদ্ধ দেশ গুলি ভবিষ্যতে তেল নির্ভর অর্থনীতিতে বলীয়ান থাকবে এবং হয়ত দেখা যাবে সেই সময় বিশ্বের অন্যান্য দেশগুলি শক্তির প্রয়োজনে অন্য কিছুকে কাজে লাগানোর ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।

খনিজ তেলের তুলনায় কয়লা পাওয়া যায় বেশী। কয়লায় ব্যবহারে বিশেষ কিছু অসুবিধা যেমন পরিবহন গত সমস্যা, কয়লার দহনে পরিবেশ দূষণ জনিত সমস্যা ইত্যাদির কারণে পৃথিবীতে জ্বালানী শক্তি হিসাবে তেলের ব্যবহার বেশী দেখা যায়।

পৃথিবীর কয়লা উত্তোলন

দেশ	উত্তোলন (লক্ষ মেট্রিক টন)		মোট উত্তোলনের শতকরা হার (%)	
	১৯৮৬	১৯৮৫	১৯৮৬	১৯৮৫
চীন	৮২.৮০	৮১.৩০	২৫.৮২	২৫.৩৫
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র	৭২.২৯	৭৪.১৩	২২.৫৫	২৩.১৩
সোভিয়েত ইউনিয়ন	৫১.১২	৪৯.৪৪	১৫.৯৪	১৫.৪২
পোল্যাণ্ড	১৯.২১	১৯.১৬	৫.৯৯	৫.৯৭
দক্ষিণ আফ্রিকা	১৭.৭১	১৭.৩১	৫.৫২	৫.৪০
ভারত	১৬.৩৩	১৪.৯৩	৫.০৯	৪.৬৬
অস্ট্রেলিয়া	১৫.৯৭	১৩.৯০	৪.৯৮	৪.৩৩
ব্রিটেন	১০.৭৯	৮.৮৬	৩.৩৬	২.৭৬
পঃ জার্মানী	৮.৭১	৮.৮৫	২.৭২	২.৭৬
অন্যান্য	২৫.৭৭	৩২.৮২	৮.০৪	১০.২৩
পৃথিবী	৩২০.৭০	৩২০.৭০	১০০.০০	১০০.০০

U. N. Monthly Bulletin of Statistics, October, 1987 হইতে সংগৃহীত।

জ্বালানী হিসাবে প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যবহার যথেষ্ট হলেও আলাদা ভাবে গ্যাসের অনুসন্ধান কার্য্য তেল অনুন্ধানের মত জোরদার করা

হয়নি। সাধারণতঃ প্রাকৃতিক গ্যাস একই সাথে খনিজ তেলের সাথে অবস্থান করে। তুলনামূলকভাবে গ্যাসের দহনে পরিবেশ দূষণ কম হয় তেলের দহনের থেকে। তবে গ্যাসের দহনে বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাইঅক্সাইডের মাত্রা ক্রমশ বাড়তে থাকে যেটা পরিবেশ সুরক্ষার ক্ষেত্রে খুবই বিপজ্জনক।

ভূ-তাপের ব্যবহার

উপরোক্ত জ্বালানি ছাড়া পৃথিবীর বিভিন্ন যায়গায় ভূ-তাপকে কাজে লাগিয়ে তড়িৎশক্তি উৎপন্ন করা হচ্ছে। আইসল্যাণ্ড, নিউজি-ল্যাণ্ড, ইতালি ও আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়া অঞ্চলে এই ধরনের বিদ্যুৎ কেন্দ্র দেখা যায়। বৃহৎ তিনটি ভূ-তাপ চালিত বিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রত্যেকটি ১০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন করে। প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে যে ভূ-তাপ শক্তি প্রবহমান সম্পদের আওতায় পড়ে।

খনিজ সম্পদের উৎসস্থল

এশীয় অঞ্চলের উন্নয়নশীল দেশগুলির বেশীরভাগ খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ। খনিজ আকরিকের প্রধান উৎসগুলির ভারতের ভূ-স্তরে জমা আছে। এই অঞ্চলে পাওয়া যায় লৌহ আকরিক, ম্যাঙ্গানিজ ও বিভিন্ন শ্বেতধাতুর বিশাল ভাণ্ডার। পূর্ব এশিয়ার পার্বত্য এলাকা বরাবর আছে টিন, টাংস্টেনের সমৃদ্ধ ভাণ্ডার ও অ্যান্টিমনির অদ্বিতীয় খনি উৎস। ভবিষ্যতে এই সমস্ত অঞ্চলে আরও খনিজ পাওয়া যাবে বলে আশা করা যায়।

আফ্রিকা অঞ্চল খনিজ আকরিকে বিশেষ সমৃদ্ধ। ভূ-তাত্বিক দিক থেকে আফ্রিকার খনিজ সমৃদ্ধ অঞ্চলগুলি প্রাক-কেম্ব্রিয়ান পর্বের কেলাসিত ভূ-স্তর। এই অঞ্চল গুলিতে প্রচুর পরিমাণে ক্রোমিয়াম, লৌহ, ম্যাঙ্গানিজ, ইউরোনিয়াম, টিন, তামা, সোনা, প্লাটিনাম, অ্যাস-

বেসটস ও বিভিন্ন শ্বেতধাতুর আকরিক পাওয়া যায়। কয়েকটি অঞ্চলের বিশেষতঃ দক্ষিণ আফ্রিকা অঞ্চলের ভূগর্ভে আছে হীরা ও বহু বিরল ধাতুর খনি। বক্সাইট ও ফসফোরাইট সহ অন্যান্য স্তরীভূত খনিজ আকরিকেও আফ্রিকা সমৃদ্ধ। সোনা ও হীরার ক্ষেত্রে আফ্রিকা উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশগুলিতে প্রথম স্থান অধিকার করেছে। তবে এই অঞ্চলের শক্তি উৎসের ভাণ্ডার পর্য্যাপ্ত নয়। পাথুরে কয়লার মজুদ অতি নগণ্য (বিশ্ব ভাণ্ডারের ০.৫ শতাংশের কম)। তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস পাওয়া যায় আলজিরিয়া, লিবিয়া, মিশর, নাইজিরিয়া, গ্যাবন, অ্যাঙ্গোলা এবং মহাদেশের উপকূলবর্তী অঞ্চলে। কোন কোন অঞ্চলে ভূ-তাপ শক্তির ব্যবহার দেখা যায়।

লাতিন আমেরিকার অধিকাংশ এলাকাই তেল ও গ্যাস সমৃদ্ধ, যার প্রধান ভাণ্ডারগুলি অবস্থিত ভেনেজুয়েলা ও মেক্সিকোয়। অধিকাংশ তেল ও গ্যাস ভাণ্ডার রয়েছে দেশাভ্যন্তরস্থ বিস্তীর্ণ নিম্নভূমি এলাকায় এবং আন্দিজ পার্বত্য অঞ্চলের পূর্বদিকে ও সমুদ্র উপকূলে। মেক্সিকো ও ভেনেজুয়েলার প্রাকৃতিক গ্যাসের গুরুত্ব অপরিসীম। পাথুরে কয়লা থাকা সত্ত্বেও শক্তি ব্যবস্থা বিকাশের ক্ষেত্রে তা নগণ্য ভূমিকা পালন করে।

প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকায় বহুকাল আগে রূপা ও বিভিন্ন ধাতুর বিশালাকার খনি আবিষ্কৃত হয়েছে। যা নিস্কাষণে বিশেষ স্থানের অধিকারী হল মেক্সিকো, পেরু, চিলি (তামা), বলিভিয়া (টিন)। আটলান্টিক মহাসাগর সংলগ্ন এলাকায় অতি উচ্চমানের লৌহ আকরিক, বক্সাইট, সোনা, কোবাল্ট, হীরা, বিরল মৃত্তিকা ইত্যাদি ধাতুর বিশাল ভাণ্ডারের সন্ধান পাওয়া গেছে। আন্দিজ পর্বতমালার পূর্ব্বদিকের বড় বড় আকরিক সমৃদ্ধ অঞ্চলগুলি আটলান্টিক তীরে অবস্থিত।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র একসময় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ লৌহ-আকরিক উত্তোলক দেশরূপে পরিগণিত হত। কিন্তু বেশ কয়েক বৎসর ধরে সোভিয়েত ইউনিয়ন তার শীর্ষস্থান কেড়ে নিয়েছে। ১৯৮৫ খৃষ্টাব্দে চীন, অষ্ট্রেলিয়া ও ব্রেজিলের উত্তোলনও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের উত্তোলনকে অতিক্রম করে গিয়েছে। প্রসঙ্গতঃ বলা যায় যে লৌহ-আকরিক উত্তোলনে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র বর্তমানে পঞ্চম স্থানের অধিকারী। সোভিয়েত ইউনিয়ন তামা উত্তোলনে বর্তমানে পৃথিবীতে প্রথম স্থান (১৬.১২%) অধিকার করে। এখানকার তামার খনিগুলি কাজাকাস্থান, দক্ষিণ-পূর্ব ইউরাল, কোলা উপদ্বীপ ও বলখাস অঞ্চলে অবস্থিত। তামা ছাড়া সোভিয়েত ইউনিয়ন সীসা উত্তোলনে প্রথম এবং আকরিক দস্তা উত্তোলনে পৃথিবীতে দ্বিতীয়। আবার ম্যাঙ্গানিজ উত্তোলনে প্রথম স্থান অধিকার করে। এই সমস্ত খনিজ দ্রব্য ছাড়া সোভিয়েত ইউনিয়ন অন্যান্য খনিজেও প্রচুর পরিমাণে সমৃদ্ধ।

সম্পদ সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা

সমস্ত খনিজ সম্পদকে আজকের অবস্থায় পৃথিবীর ভূস্তরে আসতে প্রায় কয়েক লক্ষ বছর সময় লেগেছে। মানব জাতির কল্যাণ সাধনে এই সম্ভারকে কাজে লাগানো হচ্ছে ঠিকই কিন্তু সাথে সাথে একথাও মনে রাখতে হবে যে এই সম্ভার সীমিত। আগামী প্রজন্মের কথা মনে রেখে বর্তমান প্রজন্মের সেই সম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে কিছুটা রক্ষনশীল মনোভাবের পরিচয় দেওয়াটা বাঞ্ছনীয়। তবে একথা সত্য যে প্রকৌশলগত জ্ঞান বৃদ্ধির সাথে তুলনামূলক ভাবে নিম্নমানের ধাতব খনিজের ব্যবহার ভবিষ্যতে হতেই পারে এবং বিভিন্ন ধাতুর পুনর্ব্যবহারও সম্ভবপর হবে। ধাতুর পুনর্ব্যবহার কর্ম যজ্ঞে প্রয়োজন হবে প্রচুর পরিমাণ জ্বালানির বা "ব্যবহার দ্বারা খরচ করা হয়" সম্পদের।

প্রাকৃতিক সম্পদের সংরক্ষণ বলতে সুপরিকল্পিত ভাবে তাদের আহরণ পরিচালনা করা (বিশেষ করে ধ্বংস, অপব্যয় ইত্যাদির হাত থেকে বাঁচিয়ে) বুঝায়।

আর মাত্র বছর দশকের মধ্যেই মানুষ একবিংশ শতাব্দীতে পদার্পণ করবে। আজকের দিনে যারা আশা করছেন যে আগামী শতাব্দীতে জীবনযাত্রা একইভাবে যাবে, তাদের ভাবনার কোন বিশেষ যুক্তিপূর্ণ ভিত্তি নেই। আগামী শতাব্দীতে প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার সম্পর্কীয় অনেক রকম চিন্তা বা পথ মানুষের সামনে থাকবে। যে ভাবে প্রাকৃতিক সম্পদকে তার নিজের প্রয়োজনে কাজে লাগিয়েছে সেই একইরকম পথ পুনরায় অনুসরণ করা বাঞ্ছনীয় হবে না।

□

পরিবেশ সংরক্ষণে পশ্চিমবঙ্গের ভূগর্ভস্থ জলসম্পদ ও তার ব্যবহার

দিলীপ কুমার খাঁ

ভূ-পৃষ্ঠে প্রাপ্ত সমস্ত প্রাকৃতিক সম্পদের মধ্যে ভূগর্ভস্থ জল সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। যদিও বা পৃথিবীর মোট আয়তনের শতকরা সত্তর ভাগ জল দ্বারা পূর্ণ তথাপি খুব সামান্য পরিমাণ জল ভূগর্ভস্থ জলসম্পদের মধ্যে পড়ে। বৈজ্ঞানিক সমীক্ষায় জানা যায় যে, প্রায় শতকরা নব্বই ভাগ স্বাদু জলের উৎস এই ভূগর্ভস্থ জলের উপর নির্ভর-শীল। তাই পানীয় জলের উৎস হিসাবে এই জলসম্পদের ব্যবহার হয়। একথা বলা বাহুল্য যে মাটির বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় এই জল প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় বিশুদ্ধ হয়। পানীয় জলের উৎস ছাড়া ভূগর্ভস্থ জলের ব্যবহার কৃষিকাজে ও শিল্পের ক্ষেত্রে ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। উচ্চ ফলনশীল ও জলদিজাতের সব দানা শষ্য চাষের জন্য সেচের জল অপরিহার্য্য এবং ভূগর্ভস্থ জলের উৎস থেকে তা নির্দিষ্ট পরিমাণে ও সময়ে করা সম্ভব হয় বলে কৃষিকাজে এই জলের ব্যবহার খুব দ্রুত হারে বেড়ে চলেছে। এই জল ব্যবহার করার জন্য চাষীকে খুব বেশী অর্থ বিনিয়োগ করতে হয় না, পরন্তু সরকারী ও আর্থিক সংস্থার সহযোগিতায় অতি অল্প বিনিয়োগে ভূগর্ভস্থ জলসম্পদ আহরণ ও উত্তোলন করা সম্ভব হচ্ছে।

ফলে গত এক দশকে কৃষিকাজে ভূগর্ভস্থ জলের ব্যবহার প্রায় পঞ্চাশ শতাংশ বেড়েছে। কৃষিক্ষেত্রে বিপ্লব মূলতঃ এই জলসম্পদের ক্রমবর্দ্ধমান ব্যবহারের ফলস্বরূপ। কিন্তু ভূগর্ভস্থ জলসম্পদ ব্যবহার করার যে সমস্ত প্রাথমিক নিয়মাবলি আছে, তা বহুলাংশে ঠিক ঠিক মানা হয় না, ফলে চাষীকে অনেক সময় সমস্যায় পড়তে হয়, এবং পরিবেশ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে তার ব্যাপক প্রভাব দেখা যায়। তাই এই সমস্যার আলোচনা প্রসঙ্গে ভূগর্ভস্থ জলের উৎস ও প্রবাহ সম্বন্ধে দু-চার কথা বলা প্রয়োজন।

ভূগর্ভস্থ জলের উৎস ও প্রবাহ

ভূগর্ভস্থ জলসম্পদ প্রধানতঃ নির্ভর করে ভূ-প্রকৃতি ও বৃষ্টিপাতের উপর। কারণ বৃষ্টির জলই ভূগর্ভস্থ জলের প্রধান উৎস। বৃষ্টির জল মাটির উপর পড়ার পর স্বাভাবিক ধর্ম অনুযায়ী কিছু অংশ মাটির ছিদ্র পথ দিয়ে নিচে প্রবেশ করে, আর বাকি অংশ জমির ঢাল ধরে জলপ্রবাহরূপে নদী বা অন্য কোন জলাশয়-এ গিয়ে মেশে। প্রধানতঃ জমির যে অংশ বালি বা দোআঁশ মাটি দ্বারা গঠিত সেই অংশ দিয়ে বৃষ্টির জল ভিতরে প্রবেশ করে ও মাটির নিচে একটা বিশেষ স্তরের মধ্যে জমির ঢাল অনুযায়ী প্রবাহিত হয়। ভূবিজ্ঞানের ভাষায় মাটির নিচে এই বিশেষ স্তরকে একুইফার (aquifer) বলা হয়। মাটির গঠন অনুযায়ী এই স্তরের গভীরতা ভিন্ন হয়। তাই কূপ খনন করার সময় মাটির এই বিশেষ স্তরের উপর নির্ভর করা হয়। জলপূর্ণ এই স্তরগুলি সবসময় প্রবহমান অবস্থায় থাকে। তাই যখন কোন ছিদ্রপথে উপর থেকে ঐ স্তরে পৌঁছানো যায় তখন ঐ প্রবহমান জলের সন্ধান পাওয়া যায়। কোন্ কোন্ সময় ঐ জলপ্রবাহ অতি উচ্চ চাপযুক্ত অবস্থায় থাকে তাই কোন ছিদ্র পেলে তা দ্রুতবেগে নির্গত হয়। প্রধানতঃ

ভূগর্ভস্থ জলের এই অবস্থা দেখা যায় সেই সমস্ত স্থানে যেখানে মাটির উপরিভাগ কাদামাটি দ্বারা গঠিত।

আবার শক্ত শিলাযুক্ত স্থানে ভূগর্ভস্থ জলপ্রবাহ ভিন্ন রকমের হয়। কারণ, ঐ স্থানে শিলার উপরকার ফাটলের মধ্য দিয়ে বৃষ্টির জল নিচে প্রবেশ করে ও প্রবাহিত হয়, এবং স্থান বিশেষে শিলার অভ্যন্তরে Weathered residuum-এ জমা হয়। সাধারণ ভাবে শক্ত শিলা দ্বারা গঠিত ভূভাগে ভূগর্ভস্থ জলপ্রবাহ পলিমাটি দ্বারা গঠিত অঞ্চলের জলপ্রবাহের তুলনায় কম হয়। এই কারণে শক্ত শিলা দ্বারা গঠিত অংশে প্রধানত পাতকুয়ার সাহায্যে ভূগর্ভস্থ জল উত্তোলন করা হয়। স্বাভাবিক ভাবে এই জলের পরিমাণ কম হওয়ায় সেচ ও শিল্পে এই জলের ব্যবহার কম। পশ্চিমবঙ্গের শক্ত শিলা-দ্বারা গঠিত অংশ ভূগর্ভস্থ জলের অপ্রতুলতার জন্য খরা প্রবণ অঞ্চলে পরিণত হয়েছে।

বৃষ্টিপাত ভূগর্ভস্থ জলের প্রধান উৎস, তাই এই জলের আলোচনা প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের বৃষ্টিপাতের গতি ও প্রকৃতি জানা দরকার। ভৌগোলিক অবস্থানের জন্য পশ্চিমবঙ্গে বৃষ্টিপাত প্রধানতঃ গ্রীষ্মের শেষে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে হয়। সাধারণ ভাবে জুন থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত বৃষ্টিপাত স্থায়ী হয়। এই সময় মাসে গড়ে তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশ সেন্টিমিটার বৃষ্টিপাত হয়। তবে এই বর্ষণের পরিমাণ সর্বত্র সমান হয় না। উত্তরে হিমালয়ের পাদদেশে এর পরিমাণ সবথেকে বেশি। প্রায় তিন'শ সেন্টিমিটারের মত। পশ্চিমে শক্ত শিলাযুক্ত মালভূমি অঞ্চলে বর্ষণ খুব কম, প্রায় একশ' তিরিশ সেন্টিমিটারের মত। দক্ষিণে ও মধ্যভাগে এই বর্ষণের পরিমাণ একশ' আশি সেন্টিমিটার। অবস্থান ভেদে বৃষ্টিপাতের তারতম্য অনেক বেশি হওয়া সত্ত্বেও বিস্তৃত সমভূমি অঞ্চলে মাটির নিচে একুইফারকে জলসমৃদ্ধ করতে এর সামান্য অংশ কাজে

লাগে। সারা দেশে মাটির গঠন অনুযায়ী বৃষ্টির জলের একটা অংশ মাটির ভিতরে প্রবেশ করে ও ভূগর্ভস্থ জলের যোগান দেয়। এহ প্রক্রিয়াকে বলা হয় রিচার্জ (recharge)। যেহেতু বৃষ্টির ভূগর্ভস্থ জলের যোগান দেয় তাই এর কোন শেষ নাই। আবার বৃষ্টি জলের বেশ কিছু অংশ মাটির ভেতরে প্রবেশ করে ও পরে মাটির উরে জলপ্রবাহ রূপে ফিরে আসে। অসংখ্য নদী বা ঝরণার আকারে এই প্রকার জলপ্রবাহ অন্য কোন নদী বা জলাশয়ে গিয়ে মেশে। এই প্রক্রিয়াকে rejected recharge বা পরিত্যক্ত রিচার্জ বলে। বর্ষার পরে উত্তরবঙ্গের সমভূমি অঞ্চলে এবং মালভূমির প্রান্ত দেশে এই রকম অসংখ্য নদী প্রবাহ ও ঝরনা দেখা যায়।

ভূগর্ভস্থ জলসসম্পদের পরিমাপ

প্রতি বৎসর যে পরিমাণ ভূগর্ভস্থ জল উত্তোলন করা হয় প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় তার সবটুকু বৃষ্টির জলে পূর্ণ হয়, ফলতঃ কখনই এই জলসম্পদ শেষ হয় না। কিন্তু ভূপ্রকৃতির ভিন্নতার জন্য এই জলসম্পদের যোগানের তারতম্য দেখা যায়। তাই ব্যবহারের পূর্বে এর সঠিক পরিমাপ জানা দরকার। সাধারণ ভাবে ভূগর্ভস্থ প্রবহমান জলধারার উৰ্দ্ধসীমা ও নিম্নসীমার পার্থক্য থেকে কতটা জলসম্পদ উত্তোলন করা যাবে তার হিসাব পাওয়া যায়। অর্থাৎ জলতল সীমার এই ওঠানামার পরিমাপ থেকে আমরা ভূগর্ভস্থ জলসম্পদের সঠিক পরিমাণ জানতে পারি। স্বাভাবিক ভাবে বর্ষাকালে জলের উৰ্দ্ধসীমা ও গ্রীষ্মকালে নিম্নসীমা পরিমাপ করা যায়। জলতলের এই ওঠানামার জন্য অনেক স্থানে গ্রীষ্মকালে জল উত্তোলন করা একটা সমস্যা হয়। প্রধানতঃ মালভূমির শক্ত শিলা দ্বারা গঠিত অংশে যেখানে শিলার ফাটলের মধ্যে দিয়ে জলধারা প্রবাহিত হয় সেই সমস্ত স্থানে গ্রীষ্মকালে জলতলসীমা এত নীচে নেমে যায়ে যে সামান্য পরিমাণ জল সংগ্রহ করা সম্ভব হয়। বহুস্থানে কূপগুলি

জলশূণ্য হয়ে পড়ে। সমভূমির অনেক স্থানেও অপরিকল্পিত ভাবে নলকুপের সাহায্যে জল উত্তোলন করা হয়। গ্রীষ্মকালে জলতল-সীমা নেমে যাওয়ার জন্য এখানেও জল উত্তোলনে অনেক সমস্যা দেখা দেয়।

একমাত্র মালভূমির শক্ত পাথুরে অঞ্চল ছাড়া সমগ্র সমভূমিতে গড় বাৎসরিক জলতলসীমার ওঠানামা তিন থেকে পাঁচ মিটারের মত। আবার নদী বা জলাশয়ের কাছাকাছি স্থানে এর পরিমাপ আরো কম। হিমালয়ের পাদদেশে ও শক্ত পাথুরে অংশে এই জল-তলসীমার গড় ওঠানামা দশ মিটারের মত এবং স্থান বিশেষে এর পরিমাপ আরো অনেক বেশি। একটা হিসাব থেকে জানা যায় যে, পশ্চিমবঙ্গে সত্তর লক্ষ হেক্টর সমভূমি অঞ্চলে আনুমানিক সতের শ কোটি (এক ঘন মিটার সমান এক হাজার লিটার) ব্যবহার করার উপযোগী ভূগর্ভস্থ জলসম্পদ আছে। বর্ত্তমানে এই জলসম্পদের শতকরা তিরিশ ভাগ উত্তোলন করা হয় প্রধানতঃ পানীয় জল ও চাষের কাজে।

ভূগর্ভস্থ জলসম্পদের বর্ত্তমান ব্যবহার

ভূপ্রকৃতির তারতম্যের জন্য ভূগর্ভস্থ জলের ব্যবহার ভিন্ন হয়। পশ্চিমবঙ্গের ভূপ্রকৃতি খুবই বৈচিত্র্যপূর্ণ। এই রাজ্যের উত্তরে সুউচ্চ হিমালয় পর্বত, পশ্চিম মালভূমি ও অবশিষ্ট অংশে বিস্তৃত সমতল ভূমি আছে। সামগ্রিক ভাবে দেখলে পশ্চিমবঙ্গে সমতলভূমির প্রাচুর্য্যই বেশি। এই সমতলভূমি বেশ কয়েকটি নদী দ্বারা বিধৌত ও স্থান বিশেষে ভিন্ন নামে পরিচিত। মাটির স্তর বিন্যাস অনুযায়ী এই সমভূমি ভূগর্ভস্থ জলসম্পদে সমৃদ্ধ। তবে সমভূমির সব স্থান থেকে সম পরিমাণ ভূগর্ভস্থ জলসম্পদ আহরণ করা সম্ভব হয় না। কারণ হিসাবে বলা যায় যে, পশ্চিমবঙ্গে সব স্থানে ভূগর্ভস্থ জলসম্পদের চাহিদার তারতম্য। যেহেতু ভূগর্ভস্থ জলসম্পদের চাহিদার প্রায় সবটুকু

উন্নত কৃষি প্রযুক্তির ফলস্বরূপ, সেইহেতু এই জলসম্পদের উত্তরোত্তর চাহিদা খুব সীমিত। মূলতঃ নদীয়া, মূর্শিদাবাদ, বর্ধমান, হুগলী, উত্তর ২৪ পরগণা, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পশ্চিম দিনাজপুর, মালদহ ও বীরভূম প্রভৃতি জেলার সমভূমি অঞ্চলে উন্নত কৃষিপ্রযুক্তি প্রয়োগের ফলে এই সকল স্থানে ভূগর্ভস্থ জলসম্পদের ব্যবহার ব্যাপক ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই উন্নতি কৃষি প্রযুক্তিতে সেচের জল অপরিহার্য্য তাই খুব ব্যাপক হারে এখানে নলকূপ খনন করে ভূগর্ভস্থ জলসম্পদ উত্তোলন করা হয়। ফলস্বরূপ অনেক স্থানে জলস্তর নলকূপের উত্তোলন সীমার নিচে নেমে যায়। তাই প্রয়োজনের সময় চাষী এই জলসম্পদের ব্যবহার থেকে বঞ্চিত হয়। যদিও বিভিন্ন সময়ে এই অঞ্চলে ভূগর্ভস্থ জলসম্পদের পরিমাণ নির্ণয় করার চেষ্টা করা হয়েছে তথাপি সঠিক পরিমাণ নির্ণয় করা সম্ভবপর হয়নি। বিভিন্ন সমীক্ষায় এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, এই বিস্তৃত সমভূমি অঞ্চলে বহু স্তরীয় আঞ্চলিক একুইফার আছে এবং এখান থেকে নলকূপের সাহায্যে প্রায় একশ পঞ্চাশ ঘন মিটার জল (প্রায় এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার লিটার) প্রতি ঘণ্টায় উত্তোলন করা সম্ভব। মালভূমির প্রান্ত সীমায় যেখানে সমভূমির জমা মাটির গভীরতা কম, সেখানে নলকূপের সাহায্যে গড়ে ঘণ্টায় পঞ্চাশ ঘন মিটারের বেশি জল পাওয়া সম্ভব নয়। পরন্তু উত্তরে তরাই ও ডুয়ার্সের সমভূমি এবং উপকূলীয় সমভূমি অঞ্চলে ভূগর্ভস্থ জলসম্পদের প্রাচুর্য্য থাকা সত্ত্বেও তার ব্যাপক ব্যবহার সম্ভব হয়নি। উত্তরে তরাই ও ডুয়ার্সের সমভূমি অঞ্চলে পলিমাটির সমাবেশ অন্য স্থানের পলিমাটির থেকে ভিন্ন। এখানে পলিমাটির মধ্যে বিশালকায় বোল্ডারের সমাবেশ নলকূপ খননের প্রধান অন্তরায়। তাই নলকূপ খননের দ্বারা এখানে ভূগর্ভস্থ জলসম্পদের ব্যাপক আহরণ ও উত্তোলন করা যায়নি।

উপকূলীয় সমভূমি অঞ্চলে স্বাদু জলের উৎস মাটির গভীর

স্তরে থাকার জন্য নলকূপ খনন খুব ব্যয়সাধ্য তাই ব্যাপক ভাবে নলকূপ খনন এখানে কার্য্যকর হয়নি। শক্ত পাথুরে মালভূমি অঞ্চলে ভূগর্ভস্থ জলের অপ্রতুলতা এই জলসম্পদ আহরণ ও উত্তোলনের প্রধান অন্তরায়।

পরিবেশ সংরক্ষণ ও ভূগর্ভস্থ জলসম্পদ

পশ্চিমবঙ্গে ভূগর্ভস্থ জলসম্পদের ব্যবহার এখন অর্থনৈতিক বিচারে খুবই অপ্রতুল। কিন্তু স্থান বিশেষে এর উত্তরোত্তর চাহিদা ও ব্যাপক ব্যবহার সংশ্লিষ্ট সকলের ভাবনার কারণ। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, হলদিয়া বন্দর অঞ্চলে শিল্পের প্রয়োজনে জলের চাহিদা এত বৃদ্ধি পেয়েছে যে শুধুমাত্র ভূগর্ভস্থ জলসম্পদ থেকে অদূর ভবিষ্যতে তার সম্পূর্ণ চাহিদা মেটানো সম্ভবপর হবে না, কারণ ঐ অঞ্চলে একুইফার থেকে অধিক পরিমাণে স্বাদু জল উত্তোলন করলে সমুদ্রের লবণাক্ত জল ঐ স্বাদু জলের উৎসকে দূষিত করতে পারে। পরিবেশ সংরক্ষণে তাই স্বাদু জলের ব্যবহার এখানে সীমিত রাখা দরকার।

যেহেতু ভূগর্ভস্থ জলসম্পদ জনগণের সম্পত্তি কিন্তু এর ব্যবহার সম্পর্কে আমরা খুবই উদাসীন। অতি অল্প আয়াসে এই জলসম্পদ পাওয়া যায় বলে নলকূপ খনন করার যে বৈজ্ঞানিক রীতিনীতি আছে তা উপেক্ষা করা হয়। ফলে অনেক সময় প্রয়োজনে এই জলসম্পদ চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল হয়। নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান, ও মেদিনীপুর জেলার কিছু কিছু অংশে অপরিকল্পিত ভাবে ভূগর্ভস্থ জলসম্পদ উত্তোলন করার ফলে বৎসরের কোন কোন সময়ে জলতল সীমা এত বেশী নিচে নেমে যায় যে অগভীর নলকূপগুলি জলশূণ্য হয়ে পড়ে ও পানীয় জলের যোগান এই অগভীর নলকূপ থেকে পাওয়া বেশ অসুবিধাজনক হয়। পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য এই

সমস্ত অঞ্চলে ভূগর্ভস্থ জলসম্পদের ব্যবহার আর বাড়ানো যায় না। এখানে ভূগর্ভস্থ জলসম্পদকে খুব বেশি করে সেচের কাজে ব্যবহার করার ফলে অদূর ভবিষ্যতে কৃষিকাজ সেচ নির্ভর হয়ে পড়বে। পরবর্তীকালে অর্থনীতিতে ও প্রাকৃতিক পরিবেশে এই সেচ নির্ভর কৃষিকাজ বিরূপ প্রতিক্রিয়া আনতে পারে।

উন্নত কৃষিপ্রযুক্তিতে ব্যাপক সার ব্যবহার করার ফলে সেচের জলের সাথে এই সার মিশ্রিত হয় ও মাটির স্তরের ভিতর দিয়ে ভূগর্ভস্থ জলে গিয়ে মেশে এবং বিশুদ্ধ জলকে দূষিত করে। ভূগর্ভস্থ জলের নমুনা পরীক্ষায় জানা যায় যে ব্যাপক রাসায়নিক সারের ব্যবহারের ফলে জলে নাইট্রেটের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। যদিও পশ্চিমবঙ্গে উন্নত কৃষিপ্রযুক্তিতে সারের ব্যবহারের ফলে ভূগর্ভস্থ জলসম্পদ এখন তেমন বিপজ্জনক অবস্থায় পৌঁছায়নি। তবুও পরিবেশ সংরক্ষণে সেচের কাজে ভূগর্ভস্থ জলসম্পদের ব্যবহার কম করা দরকার।

শহর ও আধাশহরের পয়ঃপ্রণালী এবং শিল্পের পরিত্যক্ত আবর্জনা থেকে ভূগর্ভস্থ জল দূষিত হয়। এই দূষিত জল ব্যবহার জনস্বাস্থ্যের পক্ষে খুব ক্ষতিকারক। সাধারণতঃ কলকাতা শহরে ব্যবহৃত জলনিকাষী ব্যবস্থার ত্রুটির জন্য শহরের পরিসীমার বাহিরে অবস্থিত নলকূপগুলির জল দূষিত হচ্ছে। জলের নমুনা পরীক্ষায় এখানকার জলে ক্ষতিকারক জীবানুর সন্ধান মিলেছে। জনস্বাস্থ্য রক্ষা ও পরিবেশ সংরক্ষণে এই প্রকার জলের ব্যবহার করা উচিত নয়।

পলিমাটি দ্বারা গঠিত অঞ্চল থেকে খুব বেশি পরিমাণ ভূগর্ভস্থ জল উত্তোলন করলে মাটির জমা স্তর ভারসাম্য হারায় এবং ক্ষেত্র বিশেষে জমির উপরিভাগ বসে যায়। অনুসন্ধানে জানা যায় যে, কলকাতা শহরের কিছু কিছু অংশ থেকে খুব বেশি পরিমাণ ভূগর্ভস্থ জল উত্তোলন করা হচ্ছে, এই সমস্ত অঞ্চলে ভূগর্ভস্থ জলসম্পদের

ব্যবহার আরো বৃদ্ধি পেলে জমির উপরিভাগ বসে যাওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাবে।

শক্ত পাথুরে অংশে পরিবেশ সংরক্ষণে ভূগর্ভস্থ জল খুব কার্য্যকরী। এই অঞ্চলে গাছপালা ভূগর্ভস্থ জলের উপর নির্ভর করে বেঁচে থাকে। এই গাছপালা তাদের শিকড় দিয়ে শক্ত পাথরের উপরকার মাটির আলগা স্তরকে ধরে রাখে ও ভূমিক্ষয় রোধ করে। অপর পক্ষে গাছপালা ঢাকা থাকে বলে এখান থেকে জল খুব তাড়াতাড়ি বাষ্পীভূত হতে পারে না বা অন্যত্র প্রবাহিত হয় না, ফলে পরিবেশ উষর হয় না।

একদিকে যেমন ভূগর্ভস্থ জলসম্পদ ব্যবহারের ফলে কৃষিবিপ্লব আনা সম্ভব, তেমনই পরিবেশ সংরক্ষণের দিকে দৃষ্টি রেখে এই সম্পদ ব্যবহার করা দরকার। তাই অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে এই সম্পদের ব্যবহার ও পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের উদ্যোগী হওয়া প্রয়োজন।

□

জনসংখ্যা, সম্পদ ও পরিবেশের ভারসাম্যহীনতা

সুভাষ চন্দ্র সাঁতরা

জনসংখ্যা

পরিবেশ সমস্যার অন্যতম কারণ হল ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা। মানুষের বিবর্তনের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, মানুষ পৃথিবীতে এসেছে প্রায় কুড়ি লক্ষ বছর আগে, আর এই সময়টুকুর মধ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির শতকরা প্রায় ৯৯ ভাগ ঘটেছে কেবল মাত্র গত কয়েক শতাব্দীতে। সাম্প্রতিককালে এর মুখ্য কারণ হল চিকিৎসা বিজ্ঞানের বহু যুগান্তকারী আবিষ্কার, যার ফলে মানুষের মৃত্যুর হার ক্রমশ কমে যাচ্ছে, বিশেষত অধুনা শিশু মৃত্যুর হার নেই বললেই চলে। স্বাভাবিক ভাবে ক্রমশ জনসংখ্যার বিস্ফোরণ ঘটেছে পৃথিবীর সবদেশেই, বিশেষ করে "উন্নতিশীল" দেশগুলিতে। বিগত কয়েক শতাব্দীর মধ্যে পৃথিবীপৃষ্ঠে যে জনসংখ্যার বৃদ্ধি ঘটেছে তার সংক্ষিপ্ত হিসাব ১নং সারণিতে দেওয়া হল।

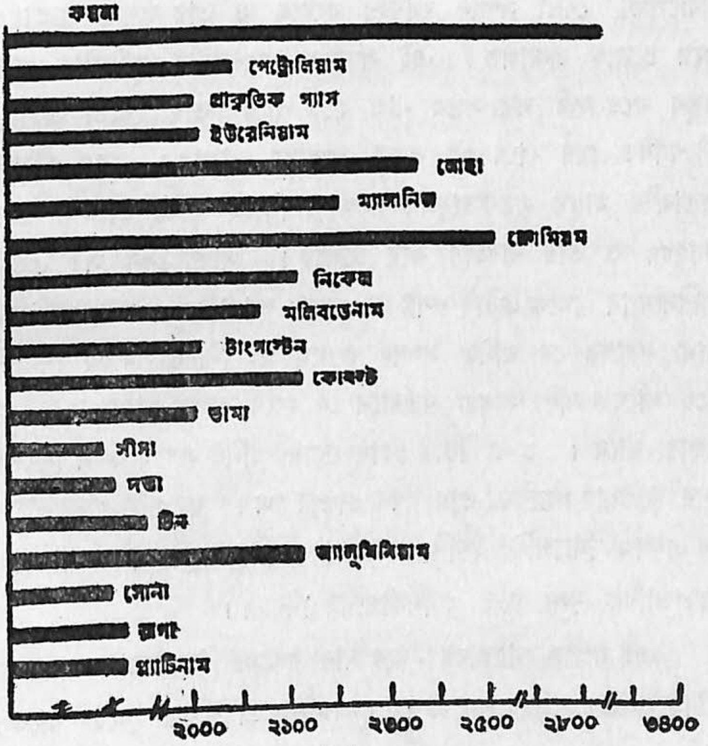
বিশেষজ্ঞদের মতে পৃথিবীর জনসংখ্যা অধুনা যে হারে বাড়ছে তা যদি বিগত পাঁচ হাজার বছর ধরে বাড়তে থাকত তাহলে পৃথিবীর বর্তমান জনসংখ্যার মোট ওজন দাঁড়াত পৃথিবীর ওজনের সমান (অর্থাৎ ৫.৯৭×১০^{২৪} কিলোগ্রাম)। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার এই ভার পৃথিবীর পরিবেশের বহন করার ক্ষমতার বাইরে এবং তাই ক্রমান্বয়ে পরিবেশের ভারসাম্যহীনতা ঘটে চলেছে।

১ নং সারণি ঃ পৃথিবীর জনসংখ্যা বৃদ্ধির আনুপাতিক হার (%)

দেশসমূহ	সময়কাল							
	১৯২০ -১৯৩০	১৯৩০ -১৯৪০	১৯৪০ -১৯৫০	১৯৫০ -১৯৬০	১৯৬০ -১৯৭০	১৯৭০ -১৯৮০	১৯৮০ -১৯৯০	১৯৯০ -২০০০
ক) উন্নয়নশীল	১১	১৩	১৩*	২১	২৫	২৮	৩২	৩৪
খ) সমগ্র পৃথিবী	১১	১১	১০*	১৯	২১	২৪	২৭	৩০

*দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্য এই সামান্য হ্রাস বা স্থিতি।

১ নং চিত্র ঃ পৃথিবীতে সঞ্চিত বিভিন্ন ধরণের খনিজ সম্পদ প্রাপ্তির সম্ভাব্য আয়ুষ্কাল।



খাদ্য সম্পদ

এই ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার জন্য খাদ্য তথা অন্যান্য সম্পদের সমবণ্টনের একান্ত প্রয়োজন। এক্ষেত্রে সম্পদ সৃষ্টি, সম্পদের আহরণ ও সম্পদের সুনির্দিষ্ট বণ্টনের সামাজিক কাঠামো অবশ্য প্রয়োজনীয়। বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির ফলে, বিশেষত খাদ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে, যুগান্তকারী আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু সুনির্দিষ্ট বণ্টনের অভাবে পৃথিবীর বহুদেশের মানুষকে আজও অর্ধভুক্ত বা অভুক্ত থাকতে হয়।

খনিজ সম্পদ

তৈল, জ্বালানী গ্যাস, খনিজ পদার্থ ইত্যাদি সম্পদের আহরণ ও তার বণ্টনের ক্ষেত্রেও একই সমস্যা। বিংশশতাব্দীর মানুষই সর্বাপেক্ষা বেশী সম্পদ আরহণ করেছে ও তার যথেচ্ছ ব্যবহারও করে চলেছে ক্রমাগত। এই সম্পদের অনেকটাই পৃথিবীতে আর নতুন করে সৃষ্টি করা সম্ভব নাও হতে পারে—তাই হয়তো একদিন নিশেঃষিত হয়ে যাবে এই সকল সম্পদের ভাণ্ডার। তবুও বর্তমান শতাব্দীর মানুষ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা না নিয়েই যথেষ্ট ভাবে সম্পদের আহরণ ও তার ব্যবহার করে চলেছে। সাম্প্রতিককালের একটি পরিসংখ্যান থেকে এটাই স্পষ্ট যে ভূগর্ভে আমাদের এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত নানা ধরণের যে খনিজ সম্পদ রয়েছে তা নির্দিষ্ট সময়েই নিঃশেষ হয়ে যাবে—যদি আমরা বর্তমানে যে হারে সম্পদ আহরণ করছি তা বজায় থাকে। ১ নং চিত্রে কোন কোন খনিজ সম্পদ কখন নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা, তার বর্ণনা দেওয়া হল। কতগুলি খনিজসম্পদ যে এখনও নিঃশেষিত হয়নি, তার কারণ কিছু নতুন খনির আবিষ্কার, অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি ও নিষ্কাশনের নিয়ন্ত্রণ।

এই সম্পদ আহরণের সময়ে নানা রকমের ক্রিয়াকলাপ আমরা যা ঘটাই তাতেও পরিবেশের উপর দূষণজনিত প্রতিক্রিয়া ঘটে থাকে।

বিশেষত খনিজ লবণের বা জ্বালানীর আহরণের সময়ে দূষণ সমস্যার সৃষ্টি অবশ্যম্ভাবী। এছাড়া খাদ্য উৎপাদনের জন্য কৃষিতে যে উন্নত-তর প্রযুক্তির প্রয়োগ ঘটেছে (অধিক রাসায়নিক সারের প্রয়োগ, কীটনাশক ঔষধের প্রয়োগ ইত্যাদি)—তাতেও দূষণজনিত সমস্যা ক্রমশ বেড়ে চলেছে।

শিল্প বিকাশ

সভ্যতার ক্রমবিকাশের সাথে সাথে শিল্পেও বিকাশ ঘটেছে অভূতপূর্বভাবে। যার অবশ্যম্ভাবী ফলশ্রুতি হল পরিবেশ দূষণ। সকল প্রকার উন্নতিশীল দেশগুলি আজ এই সমস্যার শিকার হয়েছে। অবশ্য সকল প্রকার সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিকাশ হলেই যে পরিবেশের ক্ষতি সাধিত হবে তা নয়, যে কোন বিকাশ-মুখী পরিকল্পনা নিলে তার প্রয়োগের ক্ষেত্রে পরিবেশের উপর কিরূপ প্রতিক্রিয়া ঘটবে তা ভালভাবে বিবেচনা করে সঠিক প্রতিকার ও প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার আশু প্রয়োজন।

শিক্ষা ও সমাজ ব্যবস্থা

শিক্ষা ও সমাজ ব্যবস্থার কাঠামোর পরিবর্ত্তন ও উন্নতিসাধন পরিবেশ রক্ষার জন্য অত্যন্ত জরুরী। শিক্ষা আনে মানুষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক সচেতনতা। ফলে পরিবেশ সমস্যাগুলির অন্তত কিছু প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা সহজেই নেওয়া যেতে পারে। আর সামাজিক কাঠামোর গতিপ্রকৃতি অনুধাবন অত্যন্ত মূলবান। অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা, সম্পদের অসমবন্টন ও পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা আনে মানুষের মধ্যে অনৈক্য ও বিভেদ—যার অবশ্যম্ভাবী ফলশ্রুতি হল পরিবেশ দূষণ ও পরিবেশের ভারসাম্যহীনতা।

অর্থনৈতিক লাভের জন্য নতুন শিল্প প্রসারে কোন বাড়তি সর্তকতা নেওয়াই হয়নি। বহুক্ষেত্রে তাতে দেখা দিয়েছে দূষণজনিত

নানান নমস্যা। সাম্প্রতিককালের ভূপাল দুর্ঘটনা তারই প্রতিফলন। মানুষের চাহিদা বিশেষ করে অন্ন, বস্ত্র ও জ্বালানী ইত্যাদির চাহিদা সৃষ্টি করেছে নানান সমস্যা, যথা—বনাঞ্চলের হ্রাস, পানীয় জলের অভাব, জ্বালানী ও খনিজ পদার্থের অভাব ইত্যাদি। আমাদের চার পাশের জল, বায়ু ও মাটি আজ দূষণের কবলে আক্রান্ত। মানুষ তথা অন্য প্রাণীদের অস্তিত্ব পৃথিবীর বুকে আজ বড়ই বিপন্ন হতে চলছে। তাই পৃথিবীজুড়ে শুরু হয়েছে পরিবেশ রক্ষার আন্দোলন, দূষণ মুক্তির আন্দোলন ও পরমাণু যুদ্ধ প্রসাররোধের আন্দোলন।

প্রতিরোধ কর্মসূচী

এরকম এক সংকটময় মূহূর্তে, বিংশশতাব্দীর শেষভাগে আমরা সারা পৃথিবীর মানুষ আজ একাত্মভাবে নানান কর্মসূচী নিয়েছি যাতে পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখতে পারি। শুরুতেই নেওয়া হয়েছে জনসংখ্যা হ্রাস ও জন্মনিয়ন্ত্রণমূখী নানাবিধ পরিকল্পনা। এতে লাভ হয়েছে উন্নত দেশগুলিতে। কিন্তু উন্নতিকামী ও অর্থনৈতিক অনগ্রসর দেশগুলিতে তেমন ফলপ্রসূ সফলতার ইঙ্গিত মেলেনি। এর মুখ্য কারণ হল শিক্ষার অসম বিকাশ ও স্বার্থান্বেষী দেশগুলির উসকানী। ধর্মীয় গোঁড়ামী অনেকাংশে এক্ষেত্রে বাধার প্রাচীর তুলেছে। নতুন করে তাই চাই তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে জনসংখ্যা হ্রাসরোধী সমাজচেতনার।

অধুনা খাদ্য উৎপাদনের জন্য কৃষিতে ঘটেছে নানান প্রযুক্তির প্রয়োগ, যার অনেকগুলির মধ্যদিয়ে পরিবেশে দূষণ ঘটেছে। তাই চাই এই প্রযুক্তিগুলির পুনর্মূল্যায়ন যার ফলে পরিবেশের সবচেয়ে কমক্ষতি সাধিত হয়। মানুষের খাদ্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর জন্য ভবিষ্যতে চাই সামুদ্রিক সম্পদের পূর্ণ সদ্‌ব্যবহার।

বনসম্পদ ও বন্যজীবজন্তুর দ্রুত হ্রাস হয়ে যাওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। এই সম্পদ রক্ষায় চাই নতুন নতুন বনাঞ্চলের

সৃষ্টি, অভয়ারণ্য ও জাতীয় পার্ক ইত্যাদিকে বাঁচিয়ে রাখার প্রচেষ্টা। তাছাড়া যে সব দেশে সুবিস্তীর্ণ মরুভূমি বা অনুর্বর পতিত জমি রয়েছে তার পুর্ণ ব্যবহার—যাতে বর্তমানে প্রযুক্তির দ্বারা বনাঞ্চল সৃষ্টি করা যায়। একাজ অত্যন্ত জরুরী কেননা এরফলে প্রাকৃতিক পরিবেশের কিছু সমতা রক্ষা সম্ভব। ফলে কমবে বন্যা ও খরার প্রকোপ। পৃথিবী পৃষ্ঠের গ্যাসীয় বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা ও কার্বনডাইঅক্সাইড গ্যাসের পরিমাণ ও ক্রমশ হ্রাস পাবে। যে সকল সম্পদের ভাণ্ডার পৃথিবীপৃষ্ঠে সীমিত—চাই তার স্বল্প ব্যবহার। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে আমরা বিংশ শতাব্দীর মানুষ সর্বাপেক্ষা বেশী সম্পদ আমাদের ভোগবিলাসের জন্য পৃথিবী থেকে আহরণ করছি। নিশ্চয় আগামী কয়েক দশকের মধ্যে এর ঘাটতি বা অভাব দেখা দেবে, যখন একবিংশ শতাব্দীর মানুষেরা দায়ী করবে তাদের পূর্ববর্তী প্রজন্মকে। তাই বেশ কিছু সম্পদের ব্যবহারে আমাদের সংযমী হতে হবে। এই আন্দোলন সারা বিশ্বজুড়ে সম্পাদিত করতে হবে।

বিভিন্ন প্রকারের দূষণ সমস্যার শিকার হয়েছে ছোট, বড় পৃথিবীর সব দেশই। আজ আমরা আমাদের চারপাশের পরিমণ্ডল অর্থাৎ জল, বায়ু ও মৃত্তিকাকে করছি কলুষিত। প্রতিরোধের জন্য আঞ্চলিক ভাবে ও সামগ্রিক ভাবে নানাবিধ ব্যবস্থাও গ্রহণ অতীতে করা হয়েছে, ও হচ্ছে বর্তমানে। কিন্তু স্বার্থান্বেষী মানুষদের মুনাফার লোভ এই প্রয়াসকে পুরোপুরি কাজে লাগাতে সাহায্য করেনি। নানা প্রকার বিভ্রান্তিমূলক, প্ররোচনামূলক প্রচার চলেছে দেশে দেশে, স্থানে স্থানে। একই সঙ্গে চলেছে মারণাস্ত্র সৃষ্টি ও মারণাস্ত্র প্রসাররোধী শান্তি চুক্তি। বিগত কয়েক শতাব্দীতে বিভিন্ন দেশে পরিবেশ রক্ষার জন্য ও দূষণ রোধের জন্য নানা আইন প্রণয়ন করা হয়েছে—কিন্তু বাস্তবে তার সফলতা দেখা যায়নি। তাই সর্ব-স্তরের মানুষের সমস্যা সম্পর্কে চেতনাবোধ, কর্তব্যবোধ ও প্রতিরোধ

মুখী গণআন্দোলনের ব্যাপক প্রস্তুতি চাই দেশজুড়ে, পৃথিবীজুড়ে।

শুরুতেই আমরা সবকাজ একসাথে নিতে পারবো না। তাই ধীরে ধীরে পর্যায়ক্রমিক ভাবে এগোতে হবে। জনসংখ্যা প্রসাররোধ যা প্রতিটি মানুষের নিজের আয়ত্তের মধ্যে তাকে দিতে হবে সর্বাধিক গুরুত্ব। তারপরই শুরু করতে হবে সম্পদ সৃষ্টি ও সম্পদের সুষম বণ্টননীতি সমাজবস্থার মধ্যে চালু করা। এরপর চাই পরিবেশ দূষণ-রোধে, নতুন বনাঞ্চলের সৃষ্টি, পানীয় জলের সংরক্ষণ ও সুষমব্যবহার ও অপচয় রোধ করা ইত্যাদি নানান ব্যবস্থাদির। শক্তি সঞ্চয় ও আহরণের নতুন দিকগুলি খতিয়ে দেখতে হবে নতুন করে। যাতে পরিবেশের কোন ক্ষতি ব্যতিরেকেই শক্তি আহরণের নতুন দিগন্ত সূচিত হয়। সৌরশক্তির যথোপযুক্ত আহরণ ও ব্যবহার হবে আমাদের ভবিষ্যতের লক্ষ্য। এরপরেই চাই সুবিশাল সামুদ্রিক জল সম্পদের সংরক্ষণ ও সঠিক ব্যবহার। দুর্ভাগ্যের ও পরিতাপের বিষয় হল, এই বেশ কয়েক দশক ধরেই বিশেষত উন্নতিশীল দেশগুলি সমুদ্রকে করেছে আবর্জনার স্তূপ। এখানেই ফেলে দেওয়া হচ্ছে বিষাক্ত পদার্থ সমূহকে, এখানেই প্রচুর পরিমাণে পরিত্যক্ত রাসায়নিক তেজষ্ক্রিয় পদার্থকে নির্বিচারে গোপনে ঢেলে দেওয়া হচ্ছে। এছাড়া অহরহই, স্থানে স্থানে ঘটে চলছে খনিজ তেলের প্লাবন। আমরা কিভাবেই না ভুল পথে পরিচালিত হচ্ছি—আমরা আমাদের অস্তিত্বকে পৃথিবীর বুক থেকে মুছে ফেলতে দ্বিধাও করছি না।

আজ তাই সকল শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের কাছে এই এক আহ্বান আসুন আমরা সারা বিশ্বের সকল ধর্মের ও কর্মের মানুষ এক হয়ে পরিবেশ রক্ষার আন্দোলনে সামিল হই। এটাই হবে আমাদের বেঁচে থাকার ও পৃথিবীকে বাঁচিয়ে রাখার মূলমন্ত্র।

□

বনভূমি, পরিবেশ ও মানুষ

রুদ্রদেব বন্দ্যোপাধ্যায়

বনভূমির ভূমিকা

এই পৃথিবীতে মানুষের বসবাসের অনুকূল পরিবেশ গড়ে তোলায় এবং সেই পরিবেশ বজায় রাখায় বনভূমির ভূমিকা বিরাট। পরিমণ্ডলে অক্সিজেনের জোগান, কার্ব্বন-ডাই অক্সাইড অপসারণ, জলবায়ুকে অনুকুল ভাবে প্রভাবিত করা, বায়ুমণ্ডলের তাপ নিয়ন্ত্রণ, ভূমিক্ষয় রোধ প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় কাজেই বনভূমির সহায়ক ভূমিকা প্রতীত। এক একর সবুজ বনভূমি প্রায় আড়াইশো কিলোগ্রাম অক্সিজেনের জোগান দিতে পারে আর সাড়ে তিনশো কিলোগ্রামেরও বেশী কার্ব্বন-ডাই অক্সাইড অপসারণের ক্ষমতা রাখে। একটি গাছ পরিবেশ বিশুদ্ধ রাখার জন্যে যে কাজ করে সেই কাজ আধুনিক প্রযুক্তি বিদ্যার সাহায্যে করতে গেলে বর্তমান সময়ে খরচ হবে প্রায় ১৬ লক্ষ টাকা।

এই বনভূমির সাথে কৃষিকাজও সম্পর্কযুক্ত। বনভূমি না থাকলে বৃষ্টিপাত কম হয়। বনভূমির উদ্ভিদেরা তাদের মূল, কাণ্ড, শাখা-প্রশাখার মধ্যে বহুল পরিমাণে জল সঞ্চিত রাখে এবং জলীয় বাষ্প নিষ্কাষণের দ্বারা পরিবেশে আদ্র'তা বজায় রাখে। বন-জঙ্গল থাকলে মাটি নরম থাকে, নদী, ঝর্ণা প্রভৃতির জলধারা নিরবচ্ছিন্ন

থাকে। অন্যদিকে বনভূমি ধ্বংস হ'লে মাটি শুক্নো হয়, জলের প্রাপ্যতা হ্রাস পায়, ভূমিক্ষয়ের ফলে মাটির ওপরের স্তরের উর্বর অংশ ক্রমান্বয়ে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে মাটিকে করে অনুর্বর। সুতরাং বনভূমি ধ্বংস হ'লে আনুপাতিক হারে বৃদ্ধি পাবে মরু অঞ্চল যা মানুষের বসবাসের অনুপোযোগী। বনজ-সম্পদ থেকেও মানুষ বঞ্চিত হ'বে। তাই উদ্ভিদ যে মানুষের বন্ধু এবং প্রকৃতির প্রাণ এই সত্য উপলব্ধি করতে না পারলে তার ফল হ'বে সুদূরপ্রসারী।

বনভূমির ক্রমবিলুপ্তি ও তার কারণ

সভ্যতার বিকাশের সাথে বনভূমি ধ্বংসের হার অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। প্রাগৈতিহাসিক যুগে সিন্ধু উপত্যকায় ছিল ঘন বন। নগর সভ্যতা গড়ে তুলতে বনাঞ্চলের বহু গাছপালা কেটে ফেলা হয়েছিল। উপরন্ত জ্বালানি কাঠের চাহিদা মেটাতে এবং গৃহনির্মানের জন্যে পোড়া ইঁট তৈরীর প্রয়োজনেও নির্ব্বিচারে গাছ কাটা হয়েছিল। এইভাবে ক্রমান্বয়ে বনাঞ্চলগুলি বৃক্ষশূন্য হয়ে যায়, ফলে বৃষ্টিপাতের মাত্রা কমে গিয়ে সিন্ধু উপত্যকা মরুভূমিতে পরিণত হতে থাকে। তাই সিন্ধু সভ্যতার অবলুপ্তির একটি কারণ হিসাবে অনুমান করা হয় নির্ব্বিচারে বনভূমির ধ্বংস সাধন।

কৃষিক্ষেত্রের সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যেও পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বনভূমি ধ্বংস করা হয়েছে। কেনিয়া, উগাণ্ডা, তানজানিয়াতে কৃষি খামার গড়তে বিস্তীর্ণ বনাঞ্চলকে ধ্বংস করা হয়েছে। অনুরূপভাবে কৃষি কাজের জন্যে চীন, কানাডা, দক্ষিণ ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা প্রভৃতি দেশে ব্যাপক ভাবে বনভূমি ধ্বংস করা হয়েছে। পশুচারণের ভূমির চাহিদা মেটাতেও বনভূমি নির্ব্বিচারে ধ্বংস হচ্ছে। এই পশুচারণ ভূমি তৈরী করার জন্য ১৯৭৫ সালে এক বছরে আমাজন নদীর অববাহিকার ক্রান্তীয় বর্ষণ বনের এক লক্ষ একষট্টি হাজার বর্গ

কিলোমিটার ধ্বংস করে ফেলা হয়।

সভ্যতার ক্রমবিকাশের সাথে সাথে বৃক্ষ-সম্পদের বিপুল ব্যবহারিক সম্ভাবনার দিকগুলি প্রতীয়মান হতে থাকে। বনভূমি থেকে আহরিত কাঠ গৃহ নির্মাণে, আসবাবপত্র তৈরিতে, চাষের ব্যবহার্য সরঞ্জাম প্রস্তুত করতে, নৌকা, জাহাজ ও অন্যান্য যানবাহন নির্মাণে খেলনা ও খেলাধূলার সরঞ্জাম তৈরিতে বিপুল পরিমাণে ব্যবহৃত হতে থাকল। ফলস্বরূপ বনভূমি ধ্বংস অপরিহার্য হয়ে পড়ল। এই কারণে ইউরোপের ওক বনভূমি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। একই কারণে ক্রান্তীয় বনভূমির মেহগনি, সেগুন প্রভৃতি গাছগুলির সংখ্যা গত ছয় দশক ধরে দ্রুত হারে কমছে।

বনভূমি ধ্বংসের আর একটি প্রধান কারণ জ্বালানি হিসাবে কাঠের ব্যবহার। আফ্রিকা মহাদেশের সহেল অঞ্চলে ৫০ থেকে ৬০ শতাংশ জ্বালানি বন-জঙ্গলের গাছ কেটে পাওয়া যায়। এশিয়া মহাদেশে প্রতিবছর জ্বালানি কাঠের ব্যবহার হয় ৭৩৬০ লক্ষ ঘন মিটার আর গ্রীষ্মমণ্ডলীয় আমেরিকাতে ২৩০০ লক্ষ ঘন মিটার। উন্নয়নশীল দেশগুলিতে শতকরা ছিয়াশি ভাগ কাঠ জ্বালানি হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ভারতবর্ষে জ্বালানি কাঠের ব্যবহার শতকরা ষাট ভাগেরও বেশী এবং এই চাহিদা মেটাতে বৈধ জোগানের চেয়ে প্রায় চব্বিশ গুণ কাঠের প্রয়োজন। ভারতের বিভিন্ন বনাঞ্চল থেকে কোটি কোটি টাকার কাঠ অবৈধভাবে বৃক্ষচ্ছেদন করে পাচার করা হয়। এই অসাধু চক্রের সাথে যুক্ত আছে বেশ কিছু কাঠের ব্যবসায়ী, ঠিকেদার এবং বন-বিভাগের কর্মচারী।

সভ্যতার বিকাশের পরিপূরক হিসাবে ঘটছে শিল্পায়ন এবং তার পরিকাঠামো তৈরি করতে, কাঁচামালের সরবরাহ অব্যাহত রাখতে এবং বাণিজ্যিক হারে উৎপাদন করতে প্রয়োজন হ'চ্ছে পরিবহন

উপযোগী রাস্তাঘাট, বসতি ইত্যাদি যা বনভূমি ধ্বংস করে গড়ে উঠেছে ; খনি থেকে আহরিত কয়লা ও অন্যান্য খনিজ আকরিক, বিদ্যুৎ ইত্যাদি। কয়লা ও খনিজ আকরিক উত্তোলনের প্রয়োজনে বনভূমির বিস্তীর্ণ অঞ্চল ধ্বংস করা হয়। জনপদ ও কলকারখানার বিদ্যুৎ চাহিদা পূরণের জন্য বনাঞ্চলের নদীগুলির উপর বাঁধ তৈরী হচ্ছে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের উদ্দেশ্যে। ভারতবর্ষে ১৯৫১ থেকে ১৯৭৬ সালের মধ্যে (ছাব্বিশ বছরে) রাস্তাঘাট, শিল্পাঞ্চল ইত্যাদি তৈরী করতে গিয়ে ৪২ লক্ষ হেক্টর বনভূমিকে ধ্বংস করা হয়েছে।

অনুরূপভাবে কাগজ ও কাগজের মণ্ড তৈরীর শিল্পের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে কাঠের চাহিদাও বেড়েছে কারণ পৃথিবীর শতকরা নব্বই ভাগ কাগজ তৈরি হয় কাঠের মণ্ড থেকে। এই কাঠের জোগান দিতে হ'চ্ছে বনভূমিকে। জাপান ইণ্টারন্যাশানাল ইকনমিক এসোসিয়েশানের এক হিসাব থেকে জানা যায় "নিউইয়র্ক টাইমস" পত্রিকার রবিবাসরীয় সংখ্যা প্রকাশের জন্য যে পরিমাণ কাগজ লাগে তার জোগান দিতে দৈনিক ২৫ হেক্টর বনভূমিতে উৎপন্ন কাঠের প্রয়োজন হয়। বিশ্বজুড়ে দৈনিক সংবাদপত্র ছাপতে যে কি পরিমাণ কাঠের প্রয়োজন হয় তা ভাবলে বেশ দুর্ভাবনা হয়। প্রতিটি মণ্ড উৎপাদনকারী কারখানা প্রতি বছর গড়ে প্রায় দেড় লক্ষ টন কাঠ ব্যবহার করে।

বনভূমির আর একটি বড় শত্রু দাবানল। উত্তর আমেরিকা দক্ষিণ আমেরিকা, আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়ায় প্রতিবছর বনভূমির বিরাট এক অংশ দাবানলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সাম্প্রতিক কালে যুক্তরাষ্ট্রের ইয়োলোষ্টোন ন্যাশানাল পার্কের প্রায় ১৪ লক্ষ একর জমি দাবানলে জ্বলে গেছে। ময়ূরভঞ্জ জেলার সিমলিপাল সংরক্ষিত অরণ্যের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ ধ্বংস হয়েছে এই দাবানলে। মধ্যপ্রদেশের বান্ধবগড় ন্যাশানাল পার্কও পড়েছে এই দাবানলের প্রকোপে।

এগুলি ছাড়াও বনভূমি ধ্বংসের আর একটা রাজনৈতিক কারণ সম্বন্ধেও সচেতনতা দরকার। তা হ'ল প্রচলিত যুদ্ধরীতি। যুদ্ধের সময় বোমার আঘাতে বা রাসায়নিক যুদ্ধাস্ত্রের ব্যবহারের ফলে গাছ-গাছালি ধ্বংস করা হয়েছে। যুদ্ধের পরিণামে দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার বিস্তীর্ণ বনাঞ্চল বোমার আঘাতে এবং পাতা-ঝরানো রাসায়ানিক দ্রব্যের প্রয়োগে ধ্বংস হয়েছে। ১৯৮০ সালে ইউ. এন. ই. পি 'র সূত্র থেকে জানা গেছে ভিয়েতনামে যে রাসায়ানিক যুদ্ধাস্ত্র প্রয়োগ করা হয়েছিল তা'তে সেদেশের লবণাক্ত জলাভূমির গাছপালার অপূরণীয় ক্ষতি সাধন হয়েছে।

একটা সময় ছিল যখন পৃথিবীর মোট স্থলভাগের অর্ধেকের বেশি অংশ জুড়েই ছিল বনভূমি। কয়েক বছর আগেও সারা পৃথিবীর বত্রিশ ভাগ জুড়ে ছিল বনভূমি। পরিমাণগত ভাবে চারশো বারো কোটি ষাট লক্ষ হেক্টর। বিজ্ঞানীদের মতে ইতিমধ্যেই পৃথিবীর ৪০ শতাংশ বর্ষণ-বন নির্মূল হয়ে গেছে। দু'তিন বছর আগেকার হিসাব অনুযায়ী পৃথিবী জুড়ে প্রতি মিনিটে ২২ হেক্টর-বর্ষণ-বন নির্মূল হচ্ছে। এই হার বজায় থাকলে আগামী ২০২০ খৃষ্টাব্দে পৃথিবীতে বর্ষণ-বনের অস্তিত্ব থাকবে না। ইউ. এন. ই. পি. এবং এফ. এ. ও. 'র আনুমানিক হিসাব ছিল ১৯৮৫ সালে নিবিড় বনভূমি ধ্বংসের হার হ'বে প্রতিবছর ৭৫০ লক্ষ হেক্টর ও অনিবিড় বনভূমির ধ্বংসের হার হবে প্রতিবছর ৩৮ লক্ষ হেক্টর যদি বর্তমান হারে জমির এবং বৃক্ষ-সম্পদের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। সেই হিসাব অনুযায়ী ধ্বংসের প্রায় ৯টি দেশ আগামী ২৬ বছরের মধ্যে এবং আরো ৩৩টি দেশ আগামী ৫১ বছরের মধ্যে তাদের নিবিড় বনাঞ্চলগুলিকে নিঃশেষ করে ফেলবে।

আমাদের দেশেও বনভূমি ধ্বংসের হার যথেষ্ট ভীতিপ্রদ। স্বাধীনতার আগে ভারতবর্ষের বনভূমি ছিল শতকরা প্রায় ত্রিশ ভাগ।

১৯৫১ সালে তা শতকরা সাতাশ ভাগে পৌছায়। বর্তমানে সরকারী হিসাবে ভারতের মোট ভূখণ্ডের শতকরা ২২.৮ ভাগ হ'ল বনভূমি। কিন্তু আকাশচারী উপগ্রহের তোলা ছবি অনুযায়ী ওই অনুপাত মাত্র ১১.৪ ভাগ। ন্যাশানাল রিমোট সেন্সিং এজেন্সির (১৯৮০-৮২) প্রতিবেদন থেকে জানা যায় ১৯৭৫ সালে যেখানে ভারতের বনভূমি এলাকা ছিল ৪৬০ লক্ষ হেক্টর সেটা সাত বছরে কমে দাঁড়িয়েছে ৩৫০ লক্ষ হেক্টর অর্থাৎ এই সময় ভারত তার ১১০ লক্ষ হেক্টর বনভূমি হারিয়েছে। উক্ত সংস্থার পরবর্তী প্রতিবেদন থেকে আরও জানা যায় যে বর্তমানে ভারতের বনভূমিক আচ্ছাদন মাত্র ২৫০ লক্ষ হেক্টর অর্থাৎ ইতিমধ্যে ভারতের বন-ক্ষয় হয়েছে ১০০ লক্ষ হেক্টর।

বনভূমির রূপান্তরণ

ব্যবসায়িক প্রয়োজনে ভারতবর্ষ গত কয়েক বছর ধরে পরিকল্পিত ভাবে মিশ্র প্রাকৃতিক বনভূমিকে রূপান্তরিত করছে সরলবর্গীয় বৃক্ষের বনভূমিতে। ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অব ম্যানেজমেণ্টের অধিকর্তার হিসাবে প্রায় ৪০ লক্ষ হেক্টর প্রাকৃতিক বনভূমি এইরকম ভাবে রূপান্তরিত করা হয়েছে নরম কাঠ উৎপাদনশীল বনভূমিতে যা দিয়ে কাগজ ও কাগজের মণ্ড তৈরির শিল্পের সম্প্রসারণ করা হয়েছে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে বিশ্বের সর্বত্র ক্রমান্বয়ে বনভূমির অবলুপ্তি ঘটছে এবং মরু অঞ্চল ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হচ্ছে। রাজস্থানের থর মরুভ্ূমি প্রতি বছর আধ মাইল গতিতে বিস্তৃত হ'চ্ছে। শুধু তাই নয় দেশের এক-তৃতীয়াংশ থেকে অর্ধাংশ দ্রুত পরিণত হচ্ছে খরা প্রধান অঞ্চলে।

জাতীয় অরণ্য সংরক্ষণ নীতি

বনভ্ূমি সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা এবং বনক্ষয় রোধ করতে

না পারলে তার ভয়াবহ পরিণামের ফল অনুধাবন করে স্বাধীনতার প্রায় ৫ বছর পরে জাতীয় অরণ্য সংরক্ষণ নীতি স্থিরীকৃত হয়। এই নীতি অনুযায়ী স্থির হয়েছিল যে ভারতের মোট আয়তনের তিন ভাগের এক ভাগে বনভূমিক আচ্ছাদন থাকবে—সমতলে এর আয়তন হ'বে তেত্রিশ শতাংশ এবং পাহাড়ী অঞ্চলে শতকরা ষাট ভাগ।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কর্মসূচীর শেষে দেখা গেল সাড়ে ত্রিশ হাজার হেক্টর জমিতে নতুন বনভূমির সৃষ্টি করা হয়েছে। দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অরণ্যায়নের কার্যক্রমের শেষে দেখা গেল ভারতে বনভূমির আয়তন বেড়েছে মাত্র শতকরা দু'ভাগ।

অরণ্যনীতির অসাফল্যের কারণ

১৯৭৬ সালে কৃষিবিষয়ক জাতীয় কমিশনের মন্তব্য থেকে জানা যায় এই অসফলতার কারণ এই নীতি কার্যকর করার জন্য কোন সংহত চেষ্টা করা হয় নি। ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় "সামাজিক বনসৃজন প্রকল্প গ্রহণ করা হ'ল এবং ১৬.৫ লক্ষ হেক্টর জমি এ প্রকল্পের আওতায় আনবার উদ্যোগ নেওয়ার কথা হ'ল। ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অব পাবলিক ওপিনিয়নের এক সমীক্ষায় প্রকাশ যে এই সামাজিক বনসৃজন। প্রধানত হয়েছে ধনী চাষীর জমিতে, বাকী অংশ হয়েছে বড় বড় রাস্তার ধারে, বাঁধের কিনারে অথবা রেল লাইনের দুপাশে। সাধারণ চাষী বা অরণ্যবাসী আদিবাসীরা ভয়ে এই বনসৃজন প্রকল্পের আওতায় আসতে চায়নি। ওদের ভয় যে নিজেদের জমিতে বনভূমি গড়ে তুললেই সরকার সেই বনভূমি অধিগ্রহণ করে নেবে। ১৯৮৫ সালে ৫০ লক্ষ হেক্টর জমিকে প্রতিবছর বনভূমি রূপান্তর করার যে সরকারী উদ্যোগ নেওয়া

হয়েছিল তাও সফল হয়নি। ১৯৮৫ থেকে ১৯৮৮ সালে মাত্র ৫০ লক্ষ হেক্টর জমিতে বৃক্ষ রোপণ অথবা বন-সৃজন করা সম্ভব হয়েছে। এই অসফলতার যে কারণগুলি নির্দেশ করা হয়েছে সে গুলি হ'ল প্রথমত চাষীদের মধ্যে বিপুল পরিমাণে চারাগাছ বণ্টন, যা তারা নিজেদের গৃহাঙ্গনগুলিকে ঘিরে রোপণ করেছে। এই পদ্ধতি প্রাকৃতিক বনভূমির বিকল্প হতে পারে না। এই সব চারাগাছ পতিত জমিতে রোপন করা উচিত ছিল। দ্বিতীয়ত বনবিভাগের তত্ত্বাবধানে বন-সৃজন প্রকল্পগুলি মাত্র তিন বছর চালু রেখে সেইসব বনভূমির শৈশব অবস্থাতেই তা স্থানান্তরিত করা। ফলে স্থানীয় অধিবাসীরা এই গড়ে ওঠা বনভূমি গবাদি পশুদের চারণভূমিতে রূপান্তরিত করেছে।

প্রতিকারের বিধান

প্রতিকারের যে বিধান দেওয়া হয়েছে তা হল—প্রাকৃতিক অরণ্যায়নের উপর নির্ভরশীল না হওয়া ; পশুচারণকে নিয়ন্ত্রণ করা ; সময় ও স্থান বিশেষে পশুচারণ বন্ধ করা ; বনবিভাগের পুরাতন আইনের সংস্কার সাধন (কারণ দেখান হয়েছে, হিমাচল প্রদেশে বনাঞ্চলে কৃষকদের দেবদারু গাছ ৫ টাকা হিসাবে বনবিভাগের আইনের সুযোগ নিয়ে বিক্রি করা হয়—যে গাছের বর্তমান বাজার দর ৫০০০ টাকা) ; বনবিভাগকে এ ব্যাপারে পেশাদারী মনোভাব নিতে বলা এবং জনসাধারণকে বনভূমি ধ্বংসের ভয়ঙ্কর পরিণতির কথা ও বনভূমিক আচ্ছাদনের প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে সচেতন করা। এই বিশ্লেষণ সঠিক মূল্যায়নের ভিত্তিতে হয়নি বলেই মনে হয়। এই বনসৃজন প্রকল্পের অসফলতার মূল কারণ এই পরিকল্পনা রচনায় বা প্রয়োগে সাধারণ চাষী, আদিবাসী, জঙ্গলের মানুষদের কোন সক্রিয় ভূমিকা নেই। পরিকল্পনা উপরতলা থেকে চাপিয়ে দেওয়া

হয়েছে। সাধারণ মানুষকে না বুঝিয়ে, উদ্বুদ্ধ না করে, সরকারী ও প্রশাসনিক পদ্ধতির মাধ্যমে প্রকল্প রূপায়ণের চেষ্টা করা হয়েছে। সরকারী প্রশাসনের সঙ্গে এদের সম্পর্ক সন্দেহের ও অবিশ্বাসের, নতুন প্রকল্প রূপায়ণে তাই ওদের এত ভীতি ও অনীহা। এই বৈরী সম্পর্ক দূর করে যতদিন না মানুষের সঙ্গে প্রশাসনের সুসম্পর্ক গড়ে উঠছে ততদিন এই সব প্রকল্পের মাধ্যমে সুফল পাওয়ার আশা সুদূর পরাহত। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে বনসংরক্ষণে স্থানীয় অধিবাসীদের অংশগ্রহণের সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে বেশ কিছু দেশে। ফিলিপাইনের স্থানীয় অধিবাসী যারা গাছ কেটে বনজঙ্গল পুড়িয়ে চাষের জমি তৈরী করত বর্তমানে তাদেরই সেইসব বনসংরক্ষণের দায়িত্ব দিয়ে যথেষ্ট সুফল পাওয়া যাচ্ছে। সরকার নিযুক্ত বনরক্ষক নিয়ে যে ব্যবস্থার চল ছিল তার থেকে বর্তমান ব্যবস্থা ভাল এ প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে।

অরণ্যনীতি ও ঝুম চাষ

১৯৮৮ সালে আবার নতুন করে অরণ্যনীতি গ্রহণ করা হয়েছে। এবারেও বলা হয়েছে যে ভারতের মোট ভূখণ্ডের একের তিন ভাগ বনভূমি দিয়ে আচ্ছাদিত করতে হ'বে। পাহাড় অঞ্চলে এই বনভূমির পরিমাণ হ'বে দুই-তৃতীয়াংশ। এখানে বনভূমি রক্ষার জন্য নানা বিধানও আছে কিন্তু কি ভাবে বনসৃজনের লক্ষমাত্রায় পৌঁছান যাবে তার সঠিক দিক্ নির্দেশ দেওয়া নেই।

এই অরণ্যনীতিতে ঝুমচাষীদের ঝুম চাষ বন্ধ করার নির্দেশ আছে। কিন্তু এই ঝুম চাষ প্রথার প্রচলন হয়েছে বনাজঙ্গলের অধিবাসীদের জীবনধারণের প্রয়োজনে। ভারতের মণিপুরের পার্বত্য অঞ্চলে এবং অন্যান্য অনেক বনাঞ্চলের চাষীরা জঙ্গলের গাছ কেটে অথবা জঙ্গল পুড়িয়ে চাষের জমি তৈরী করে। অল্প কয়েকবার

চাষের পর সেখানকার মাটির উর্বরতা কমে গেলে সেই জমি পরিত্যাগ করে আবার অন্য জায়গার গাছ কেটে অথবা জঙ্গল পুড়িয়ে সেখানে চাষ করে। বিশ-ত্রিশ বছর পর পর আবার পুরানো জায়গায় ফিরে আসে। ইতিমধ্যে প্রকৃতি সেই জায়গায় গড়ে তুলেছে নতুন জঙ্গল। এইভাবে চাষ করার প্রথাকে ঝুমচাষ বলে। ঝুমচাষের ফলে যে বনভূমি ধ্বংস হচ্ছে সে কথা অনস্বীকার্য। আজ এই প্রথার পরিবর্তন আশু প্রয়োজন। কিন্তু প্রশ্ন থাকে ঝুমচাষ বন্ধ করলে ঝুমচাষীদের অন্নসংস্থান হবে কি করে? তার বিকল্প ব্যবস্থা কোথায়? ওই নির্দেশিকায় ঝুমচাষীদের পুনর্বাসনের কোন বন্দোবস্তের কথা বলা নেই। যদি বৃক্ষ-সম্পদের উপর নির্ভরশীল শিল্প গড়ে ওঠে এবং সাথে সাথে বিভিন্ন রকম উন্নয়ন প্রকল্প নেওয়া হয় এবং বনবাসীরা সেইসব জায়গায় কাজ পায় তাহলেই আইনকে কার্যকর করে বনক্ষয় বন্ধ করা যাবে। অন্যথায় নয়। অবশ্যই এর সঙ্গে স্থানীয় অধিবাসীদের ঝুমচাষ প্রথার কুফল সম্বন্ধেও সচেতন করা দরকার। বনে বসবাসকারী আদিবাসীদের এ বোধ কিন্তু আছে যে বনের জীবজন্তু ও গাছকে বাঁচিয়ে রাখতে হ'বে। অনেক আদিবাসী সমাজ এই নীতিটি মেনে চলে, যেমন রাজস্থানের বিশনয় জাতি ; যদি অরণ্যনীতি নির্ধারকদের ও প্রশাসনের সদিচ্ছা থাকে তবে এ সচেতনতা গড়ে তোলা কঠিন নয়।

পূর্ব্বোক্ত কারণ ছাড়াও বন-সৃজন কর্মসূচীতে বনবাসীদের অনাগ্রহের আর একটি উল্লেখযোগ্য কারণ অরণ্য সৃজন কর্মসূচীতে সরকারী উদ্যোগে যে সমস্ত গাছ লাগানো হ'চ্ছে যথা—ইউক্যালিপটাস গাছ, তা বনবাসীদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের কোন কাজে আসবে না—বন সৃজন হ'বে, ভূমিক্ষয়রোধ হবে, শিল্পের কাজে লাগবে কিন্তু বৃক্ষতলের মাটিতে পশুচারণের উপযোগী ঘাস গুল্মাদি হবে না, জ্বালানি কাঠ পাওয়া যাবে না, গৃহনির্মাণের ও আসবাব

পত্রে তৈরীর কাঠ পাওয়া যাবে না, এমন কি এই বনে আশ্রয় নেবে না কোন পাখী বা জন্তু যা শিকার করে তাদের খাদ্যের সংস্থান হ'বে, খাবার প্রয়োজনে কোন ফলমূলও পাওয়া যাবে না। বনবাসীদের কাছে বন একটি সামগ্রিক অর্থনীতি। কাজেই সরকারী উদ্যোগে সৃষ্ট এই বনভূমি তাদের কি উপকারে লাগবে তা তাদের বোধগম্য নয় তাই অরণ্যসৃজন কর্ম্মসূচীতে তাদের কোন উপকার হ'বে এ বিশ্বাস তাদের গড়ে ওঠেনি। সুতরাং জনগণের সক্রিয় সহযোগিতা পেতে গেলে মিশ্র বন-সৃজনের কথা ভাবা উচিত।

অবৈধ ক্রিয়াকলাপ

ভারতবর্ষে বনভূমি ধ্বংসের হার কমাতে গেলে আর একটি পদক্ষেপ নেওয়া অত্যন্ত জরুরী। সেটি হ'ল অবৈধভাবে বনভূমির কাঠ কেটে পাচার করার যে সব দুষ্ট চক্র ভারতের বহু বনাঞ্চলে কাজ করছে তাদের ধ্বংস করা। আশ্চর্যের বিষয় সাম্প্রতিককালের অরণ্যনীতিতে এই অসাধুচক্রের কোন উল্লেখ নেই, মোকাবিলা করার ব্যবস্থা তো বহুদূর। এই চক্রের সাথে যুক্ত আছে বেশ কিছু কাঠের ব্যবসায়ী, ঠিকেদার এবং বন-বিভাগের কর্মচারী। বনবাসীদের দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে সামান্য অর্থের বিনিময়ে এদের কাজে লাগায় কুলি হিসাবে, কাঠ কাটায়, ট্রাকের উপর সেই কাঠ বোঝাই করায় কিন্তু মুনাফা লোটে কাঠের ব্যবসায়ীরা, ঘুষপায় কয়েকজন বন-বিভাগের কর্মচারী। এই চুরির দায়ভাগী হয় গরীব বনবাসীরা। কাজেই দেখা যাচ্ছে এই অরণ্যনীতিতে মূল সমস্যাগুলির সঠিক মূল্যায়ন হয়নি এবং স্বাভাবিক ভাবে সেইগুলি মোকাবিলা করার কোন সঠিক নির্দেশও নেই। সুতরাং সফল অরণ্যনীতি প্রণয়ন করতে গেলে বর্তমান দৃষ্টি ভঙ্গির পরিবর্তন প্রয়োজন এবং চাই জনমুখী প্রশাসন।

উপসংহার

বন-ক্ষয় রোধের নীতি নির্ধারণের সময় লক্ষ্য রাখা উচিত বন-সংরক্ষণ ও বন-সৃজন কর্মসূচী রূপায়ণের ফল যেন জনমুখী হয়। অন্যান্য প্রতিকারের উপায়গুলি কার্যকর করার পন্থা ও সঠিক নির্দেশও থাকা দরকার, যথা সুসংহতভাবে বনজ-সম্পদের ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করা, কাঠের রপ্তানি সীমিত করা, অবৈধ বৃক্ষচ্ছেদন ও কাঠের চোরাচালান বন্ধ করা, জ্বালানি কাঠের বিকল্প ব্যবস্থা করা, বিশ্বের জনগণকে বনভূমির প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সচেতন করা ও সক্রিয়ভাবে বন-ক্ষয়-রোধের কর্মসূচীতে অংশগ্রহণের জন্য উদ্বুদ্ধ করা। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে বিশ্বের জনসমষ্টির মাত্র শতকরা ৩ ভাগ ভূ-পৃষ্ঠের শতকরা ৪০ ভাগ প্রাকৃতিক সম্পদ উপভোগ করে। তবে আশার কথা বনবাসীরা বুঝতে সুরু করেছে যে তাদের আবাসভূমি আজ শিল্পপতিদের ও শহরের অধিবাসীদের নিয়ন্ত্রণে। তাই অধিকার ফিরে পাবার প্রচেষ্টায় আদিবাসীদের নেতৃত্বে বিভিন্ন অঞ্চলে গড়ে উঠেছে আন্দোলন। বৃক্ষচ্ছেদনকারীদের প্রতিহত করার আন্দোলন ও আদিবাসীরা সুরু করেছে। এই সচেতনতা ব্যপ্ত হ'লে আন্দোলন সুসংগঠিত হ'লে ও তার সাথে রাজনৈতিক সদিচ্ছা, বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও প্রযুক্তিবিদ্যার যথাযথ সমন্বয় হ'লে এ সমস্যা মোকাবিলা করার শক্ত বুনিয়াদ তৈরী হবে।

□

জনশক্তি দিয়ে জলসম্পদ রক্ষা করুন

সুশীলকান্ত কোনার

জল, মাটি ও বায়ুতে সবার অধিকার। এই তিনটিই হ'ল সকলের সম্পদ। এই সম্পদগুলির জন্য ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে পার্থক্য নেই। সবার প্রয়োজনে এগুলি ব্যবহার হয়। সকলের জীবনেই এগুলি জড়িয়ে আছে। জল, মাটি ও বায়ু প্রকৃতির তিনটি অমূল্যদান। যে সম্পদ মানুষের জীবনকে রক্ষা করে, মানুষকে জীবন দেয়, মানুষের জীবনে শক্তির সঞ্চার করে, সেই সম্পদ রক্ষা করার দায়িত্ব সকলের।

জলের নাম জীবন

জলের আর এক নাম জীবন। একটু চোখ মেলে চেয়ে দেখুন, কি ভাবে আমরা আমাদের জীবনে জলকে ব্যবহার করি। কৃষি কাজে, ক্ষেত খামারে, সেচের কাজে জলের প্রয়োজন হয়। মাছচাষের জন্য জল চাই। নৌকা, জাহাজ ও অন্যান্য জলযান চালানোর জন্য নদীতে, খাঁড়ীতে জল চাই। নিত্য প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদনের জন্য এখন জল খুবই প্রয়োজনীয়। কল-কারখানা চালাতে গেলে জল না হলে চলে না। কি মানুষ, কি পশু-পক্ষী, সবার জন্য চাই পানীয় জল। তাই মানুষ, পশু-পক্ষী

সবাইকে বাঁচিয়ে রাখতে নানাভাবে ঘুরে ফিরে জলের প্রয়োজন হয়।

যে জলের এত প্রয়োজন, যে জল ছাড়া সব কাজ বন্ধ হতে পারে, যে জল না হ'লে ক্ষেতে খামারে শষ্য উৎপন্ন হবে না, মানুষের ও পশুর খাবারে টান পড়বে, যে জল না হলে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন করা যাবে না, কলকারখানা বন্ধ হতে পারে, সর্বোপরি যে জলের অভাব হ'লে মানুষ, পশু-পক্ষী তৃষ্ণায় জীবন দিতে পারে, সেই জলের কথা আমরা প্রতি দিন কতবার চিন্তা করি? যাঁরা পরিকল্পনা রচনা করি, যাঁরা পরিকল্পনাগুলিকে রূপায়িত করি, আমরা গ্রামের শহরের মানুষ যাঁরা নিত্য একটু জলের জন্য ছোটাছুটি করি, আমরা সবাই একথা কি কখনো ভেবেছি যে জলসম্পদ দূষিত হ'লে তার প্রভাব কি ভাবে জনগণের উপর পড়তে পারে? কি ভাবে জনগণের আর্থিক কাঠামোকে ভেঙ্গে চুরমার করতে পারে? আমরা অনেকেই যে কথা ভাবিনি। ব্যস্ত জীবনে সে কথা ভাববার আমাদের সময় নেই।

প্রকৃতির জল কারোর নিজস্ব সম্পত্তি নয়। জল সম্পদ ব্যবহার করার অধিকার সবার থাকতে পারে, কিন্তু জলসম্পদ নষ্ট করার অধিকার কারোর নেই। কিন্তু তবু, একটু চোখ মেলে তাকালেই বুঝবেন, জলের অপব্যবহার করে এক শ্রেণীর মানুষ জনগণের শোষণ চালাচ্ছেন। তা না হ'লে নদীর জলকে দূষিত করে কলকারখানার উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে কি করে? যে দূষিত পদার্থ কলকারখানা থেকে নদীতে নিক্ষেপ করা হয় তা দূষণমুক্ত করতে কতটুকু অর্থ ব্যয় করতে হয়? কিন্তু যাঁরা এই ভাবে নদীর দূষণ করেন তাঁরা মনে করেন যে এই নদীর জল তাঁরা কিংবা তাঁদের পরিবার বর্গ কোন কাজে লাগাবেন না। যে পথ ধরে সেই নদী বয়ে যাবে তার দু'পাড়ে যাঁরা বাস করেন, সেই গ্রামবাসীর

কথা আমার চিন্তা করার প্রয়োজন নেই। নদী যতদিন দূষণ বইতে পারে আমি ততদিন কলকারখানার উৎপাদন বৃদ্ধি করে যাবো। নিজের সম্পদ বৃদ্ধি করে যাবো। আমার অন্য কিছু চিন্তা করার প্রয়োজন নেই। তবু আইন হয়েছে, বাধা এসেছে। কিন্তু শত বাধা সত্বেও এখন দূষণ চলেছে। সেই দূষিত জল পানীয় হিসাবে ব্যবহার করে শহর, শহরতলী ও গ্রামের মানুষের জীবন বিপন্ন হতে চলেছে। সেই দূষিত জলের প্রভাব নানা ভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে।

জলের অপব্যবহার হচ্ছে

সমীক্ষা করলে দেখা যাবে, নানা ভাবে জলের অপব্যবহার হচ্ছে। শস্য ক্ষেতে ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রকারের বিষাক্ত কীটনাশক ওষুধ বৃষ্টির জলে ধুয়ে ক্রমাগত খালবিল, নদী, নালায় এসে পড়ছে। বর্তমানে বিভিন্ন প্রকারের বিষাক্ত কীটনাশক ওষুধ শস্যক্ষেতের কীটপতঙ্গকে দ্রুত বিনাশ করার জন্য ব্যবহার করা হয়। এগুলির মধ্যে ক্লোরিনেটেড হাইড্রোকার্বন জাতীয় কীটনাশক ওষুধ যেমন ডিডিটি, বি এইচ সি, এনড্রিন, ক্লোরডেন, হেপটাক্লোর প্রভৃতি দীর্ঘদিন মাটি ও জলের মধ্যে বিষক্রিয়া বজায় রাখতে পারে। এগুলি ছাড়াও ব্যবহৃত হচ্ছে নানা প্রকারের অরগ্যানোফসফেট জাতীয় কীটনাশক ওষুধ। যেমন ডিডিভিপি, ফসফামিডন, ফলিডল, মিথাইল পারাথিয়ন ইত্যাদি। তাছাড়া ব্যবহৃত হয় কার্বামেট জাতীয় কীটনাশক ওষুধ, যেমন এনডোসালফান, এবং কয়েক প্রকারের ধাতব পদার্থ সম্বলিত ছত্রাক বিনষ্টকারী ওষুধ। বিভিন্ন প্রকারের কীটপতঙ্গ দমনের জন্য যে পরিমাণ ওষুধ ক্ষেত খামারে ব্যবহার করা উচিত, অজ্ঞতার কারণেই হোক বা যে কোন কারণেই হোক, এই ওষুধগুলি ৫ থেকে ১০ গুণ অধিক মাত্রায় ব্যবহৃত হয়।

এই অতিরিক্ত পরিমাণ ওষুধ দীর্ঘ-দিন মাটির মধ্যে সঞ্চিত হচ্ছে। তারপর বৃষ্টির জলে ধুয়ে নদীর বুকে, বিল-বাওড়ে, পুকুরে এসে পড়ছে।

এখন শুধু বড় বড় নদীই নয়, ছোট নদীর পাড়েও নানান কলকারখানা গড়ে উঠেছে। কলকারখানা চালাতে যেমন নদীর জলের প্রয়োজন হয়, তেমনি কলকারখানা চালানোর পর যে দূষিত পদার্থ নির্গত হয়, সেগুলি নদীর বুকে সহজেই ঢেলে দূরে সরিয়ে দেওয়া যায়। এর ফলে কলকারখানার মালিকের দূষিত পদার্থ পরিষ্কার করার অনেক খরচ বাঁচে। সেই দূষিত পদার্থ নদীগুলি বিনামূল্যে বয়ে নিয়ে কলকারখানা থেকে অনেক দূরে চলে যায়। বিভিন্ন কলকারখানাগুলির মধ্যে আছে পাটের কারখানা, রঙের কারখানা, কাগজ তৈরির কারখানা, চামড়ার কারখানা এবং এমনি আরও কত রকমের কলকারখানা। যে সব দূষিত পদার্থ এই কারখানাগুলি থেকে নদীর বুকে নিক্ষিপ্ত হয়, সেগুলির মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের বিষাক্ত পদার্থ বর্তমান থাকে। যেমন, মার্কারী, ক্রোমিয়াম, লেড, আয়রণ প্রভৃতি। কলকারখানার দূষিত পদার্থের সঙ্গে এই সব ধাতব পদার্থও নদীর বুকে জমা পড়ে।

বর্তমানে অনেকগুলি কলকারখানায় বিভিন্ন কাজে যেমন ডিটারজেন্ট ব্যবহার করা হয়, তেমনি বিভিন্ন স্থানে বহুল ব্যবহৃত অনেকগুলি ডিটারজেন্টের কারখানাও গড়ে উঠেছে। এই সব কারখানা থেকে নিক্ষিপ্ত পদার্থের মধ্যে ডিটারজেন্ট নামক পদার্থের অবশিষ্টাংশ বর্তমান থাকে। এই পদার্থ নদীর জলে প্রবেশ ক'রে নানাভাবে বিপর্যয় ঘটাতে পারে। দেশের সর্বত্র না হলেও বেশ কয়েকটি স্থানে পেট্রোল-জাত পদার্থ শোধন অথবা প্রস্তুতের জন্য অনেকগুলি কারখানা গড়ে উঠেছে। সেই সব কারখানা থেকে নিক্ষিপ্ত পদার্থের মধ্যে পেট্রোলিয়াম জাতীয় দূষিত পদার্থ থাকে। এগুলির মধ্যে

কয়েকটি হাইড্রোকার্বন জাতীয় পদার্থ জলজ প্রাণীর দীর্ঘমেয়াদী ক্ষতি করতে পারে।

অধিকাংশ কলকারখানা থেকে নিক্ষিপ্ত দূষিত পদার্থ এত উত্তপ্ত থাকে যে নদীর জলের অনেক খানির তাপমাত্রা দিবারাত্র বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ নদীর জলের পরিবেশ স্বাভাবিক থাকে না। নানাভাবে বিভিন্ন কলকারখানা থেকে যে সব দূষিত পদার্থ নদীর বুকে এসে পড়ছে, তার মধ্যে জৈব পদার্থও বর্তমান থাকে। এগুলি নদীর বুকে সঞ্চিত হয়। এই জৈব পদার্থ একদিকে যেমন নদীর গভীরতা হ্রাস করে, অপরদিকে তেমনি এগুলির দিবারাত্র পচনক্রিয়ার ফলে জলের দ্রবীভূত অক্সিজেন কমে যায়। এই দ্রবীভূত অক্সিজেন জলজ প্রাণীর জীবন ধারণের একটি অমূল্য সম্পদ। ফলে ক্রমাগত জলে অন্যান্য জলজ প্রাণীর সঙ্গে মৎস্যকুলের বিনাশ ঘটে। জলে দ্রবীভূত অক্সিজেন বর্তমান না থাকায় জলের পরিবেশ ক্রমাগত দূষিত হতে থাকে।

তারপর ছোট বড় শহর থেকে পয়প্রণালীর দূষিত পদার্থ অবাধে নদীর বুকে ফেলা হচ্ছে। এর অধিকাংশই দূষণমুক্ত না করেই ফেলা হয়। তাছাড়া, মানুষের ও গবাদিপশুর মলমূত্রাদিও অবাধে নদীর বুকে নিক্ষেপ করা হচ্ছে। মানুষ ও পশুপক্ষীর মৃত-দেহ এখনও নদীর বুকে নিক্ষেপ করা হয়। হয় কুসংস্কার বশতঃ, নতুবা বিবেক বিবেচনাহীন ভাবে। এই সবের পচনক্রিয়া চলে দিনের পর দিন। এগুলি জলের জৈব পদার্থের পরিমাণ বৃদ্ধি করে। জলে রোগবাহী জীবাণুর বিস্তার ঘটায়। এর ফলে এই নদীগুলির জল ক্রমাগত মানুষ ও পশুপক্ষীর পানীয় হিসাবে ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়ছে। কিন্তু এই সবই ঘটছে সকলের চোখের সম্মুখে। এই ভাবে নদীকে নালায় পরিণত করা হয়েছে। সকলের আবর্জনা নিক্ষেপের স্থানরূপে ব্যবহার করা হচ্ছে। এখনও

অনেকের ধারণা, নদীর দূষণমুক্ত করার ক্ষমতা অপরিসীম। সেই কারণে যত দূষিত পদার্থই নদীতে ফেলা হোক না কেন, নদী নিমেষে তা শোধন করতে পারে। অধিকাংশ নদীর জলই বড় ছোট শহরের বাসিন্দাদের পানীয় হিসাবে ব্যবহার করা হয়। নানা প্রকারের বিষাক্ত পদার্থ ও ভয়াবহ রোগের জীবাণু সম্বলিত সেই জলই অল্পবিস্তর শোধন করে ঘরে ঘরে পাঠানো হয়। যাঁরা গ্রামে বাস করেন, তাঁদের সেই সুযোগও নেই, সরাসরি নদী থেকে জল তুলে পানীয় হিসাবে ব্যবহার করেন। কিন্তু সেই দূষিত জল ব্যবহারের ফলে যে মারাত্মক প্রতিক্রিয়া মানুষের ও গবাদি পশুর শরীরে প্রতিদিন ঘটছে, তা কি এখনও সকলের অজানা? যাঁরা এই ভাবে জলের অপব্যবহার করেন, তাঁরা কি সেই জল ব্যবহার-কারীর শেষ পরিণতির কথা জানেন না?

জল দূষণের প্রভাব

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে জল দূষণের প্রভাব নিয়ে বহু গবেষণা হয়েছে। এখনও চলছে। কলকারখানার দূষিত পদার্থে প্রভাবিত নদীর জল ব্যবহার করলে ক্ষেতের ফসলের উৎপাদন কমছে বলে বিভিন্ন গবেষণায় বলা হয়েছে। বিভিন্ন নদীর প্রাণীসম্পদ ক্রমশ বিনষ্ট হচ্ছে। অনেকগুলি প্রজাতির জলজপ্রাণী এখন বিলুপ্ত। নদীতে অণুউদ্ভিদকণা, অণুপ্রাণিকণা ও নদীর তলদেশের বসবাসকারী প্রাণীগুলির মৃত্যু ঘটায় প্রাণিকণা, নদীগুলির অমূল্য সম্পদ মাছও শেষ হতে চলেছে। জল দূষণের ফলে নদীর বুকে এত পলি জমেছে যে নদীর গভীরতা দিনে দিনে কমে যাচ্ছে। এর ফলে নৌকা, জাহাজ ও অন্যান্য জলযান এখন নদীর বুকে চলাচল করা শক্ত হচ্ছে। এক সময়ে এই গুলিই ছিল ব্যবসা বানিজ্যের সহজ পথ। নদীর নাব্যতা কমায় সেই পথ আজ বন্ধের মুখে।

কীটনাশক ওষুধ, ধাতব পদার্থ, ডিটারজেন্ট ও পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থের দ্বারা দূষিত জল এখন সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। কয়েকটি গবেষণা থেকে জানা যায় যে ধাতব পদার্থ ও কীটনাশক ওষুধ একটি নদী থেকে কিংবা একটি বিল থেকে দুইভাবে ছড়িয়ে পড়তে পারে। এই পদার্থগুলি সমান্তরাল পথ ধরে বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়তে পারে। আবার এই দূষিত পদার্থের নিম্নমুখী প্রবাহও হতে পারে। এর ফলে মাটির উপরের জল দূষিত হলে, মাটির নীচের জলের স্তর ও দূষিত হবার সম্ভাবনা থাকে। ফলে যে সব দূষিত পদার্থ নদীর জলে এসে পড়ে, তার প্রভাব আশেপাশের গ্রামগুলিতে পুকুর, নলকূপ এবং কুয়োগুলির জলেও প্রভাব বিস্তার করতে পারে। নদীর জলই, কি শহর কি গ্রাম সর্বত্র, পানীয় জল হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এই জল ক্রমাগত দূষিত হ'লে মানুষ, গবাদি পশুর ক্ষতি হয় সবার আগে। পানীয় জলের মাধ্যমে বিষাক্ত পদার্থগুলি মানুষের শরীরে প্রবেশ করে। ফলে দূষিত পদার্থের প্রতিক্রিয়া মানুষের শরীরে দীর্ঘ-মেয়াদী প্রতিক্রিয়া দেখায়। এর ফলে শিশু, যুবক এবং বৃদ্ধ সকলেই ক্ষতিগ্রস্ত হন। এখন কতকগুলি কীটনাশক ওষুধ এবং ধাতব পদার্থ পানীয় জলে প্রবেশ করতে পারে, যা মানুষের শরীরে প্রবেশ করলে লিভার, কিডনি, চোখ এবং সর্বোপরি মস্তিষ্কের ক্ষতি করতে পারে। জলের এই বিষাক্ত পদার্থ নানা ভাবে খাদ্য শৃঙ্খলে (foodchain) প্রবেশ করতে পারে। অণুউদ্ভিদকণার শরীর থেকে এগুলি প্রবেশ করে অণুপ্রাণি কণায়। যেখান থেকে এগুলি প্রবাহিত হয় অপেক্ষাকৃত বড় জলজ প্রাণীর শরীরে। সেখান থেকে সেগুলি মাছ ও চিংড়ির শরীরে প্রবেশ করে। তারপর সেখান থেকে সেই বিষাক্ত পদার্থ মানুষের শরীরে এসে পৌঁছায়। এই বিষাক্ত জল ক্ষেত খামারে ব্যবহারের সময় সেগুলি ক্ষেতের শাক-সবজি ও শস্যের মধ্যেও প্রবেশ করে। সেখান থেকেও সেগুলি মানুষের শরীরে প্রবেশ করতে পারে। এইভাবে

বিভিন্ন প্রকার বিষাক্ত পদার্থ খাদ্য শৃঙ্খলের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে ক্রমাগত মানুষের শরীরে প্রবেশ করে এবং প্রতিক্রিয়া ঘটায়।

নদীগুলির অবস্থা

একটু নদীগুলির অবস্থা দেখুন। পলির চাপে নদীর বুক ভরাট হয়ে যাচ্ছে। প্রতিদিন পলির পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে, নদীর জল ধারণক্ষমতা কমে গেছে। এক সময় একটি নদী যত জল ধরে রাখতো, এখন তার এক-তৃতীয়াংশও ধরে রাখতে পারে না। ফলে সেই নদী থেকে সারা বছর সেচের জল পাওয়া যায় না। অপেক্ষাকৃত কম জলে দূষিত পদার্থ নিক্ষেপের মাত্রা প্রতিদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে নদীর জল আগের তুলনায় এখন অনেক বেশি দূষিত হয়ে পড়ছে। দূষিত জলে মাছ ও চিংড়ি বিনষ্ট হচ্ছে। অনেক প্রজাতির মাছ এখন নদীতে একেবারেই পাওয়া যায় না। মাছের উৎপাদন অনেক কমে গেছে। নদীর ইলিশ এখন তেমন পাওয়া যায় না। ফলে মাছ ধরে যাঁরা রুজি-রোজগার করতেন এবং সেই মাছ কেনাবেচা করে যাঁরা অন্ন সংস্থান করতেন, তাঁদের রোজগারের পথ বন্ধ হয়েছে। নদীগুলির জল ধারণের ক্ষমতা কমে যাওয়ায় বর্ষার সময় যখন চারদিকের প্রবাহিত বৃষ্টির জল এসে নদীর বুকে পড়ে তখন নদীগুলি সেই জল ধরে রাখতে পারে না। নদীর পাড় বেয়ে সেই জল চার দিকে ছড়িয়ে পড়ে। সেই বন্যায় হাজার হাজার গ্রামবাসী গৃহহারা হন। গবাদি পশুর মৃত্যু ঘটে। এই ভাবে বন্যা এখন বাৎসরিক ঘটনায় পরিণত হয়েছে।

নদীতে জলের পরিমাণ কমছে

নদীর জল ধারণক্ষমতা তো কমেছেই, তাছাড়া বৃষ্টিপাতও অনেক কমে গেছে। এর ফলে নদীতে জলের পরিমাণ প্রতিদিন

কমে আসছে। বর্ষার সময় যতটুকু বৃষ্টি হয়, নদীর বুকে পলি জমা থাকায়, সেই জল জমা থাকে না। নদীর পাড় ভেঙ্গে চার-দিকে ছড়িয়ে পড়ে সেই জল নষ্ট হয়ে যায়। আগে যেমন সময়ে বৃষ্টিপাত হ'ত, নদীর বুকে তেমন পলি না থাকায়, বৃষ্টির জলের অনেকটাই নদীগুলি ধরে রাখতে পারতো। এখন তেমনটি হয় না।

অনেকগুলি প্রাকৃতিক কারণে বায়ুমণ্ডলের স্বাভাবিক পরিবেশের পরিবর্তন ঘটিয়েছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। সেই তুলনায় ক্ষেত খামারের উৎপাদন বাড়েনি। ফলে রুজি রোজগার কমেছে। এর প্রভাব পড়েছে বনজঙ্গলের উপর। ক্রমাগত বনজঙ্গল উচ্ছেদ করা হচ্ছে। বন জঙ্গল উচ্ছেদের সহজ উপায় হ'ল, আগুন ধরিয়ে দেওয়া। নিমেষে বিনাখরচে বনজঙ্গল পরিস্কার হয়ে যাচ্ছে। সেখানে বসতি গড়ে উঠছে। ক্ষেত খামার গড়ে তোলা হচ্ছে। বনজঙ্গল পুড়িয়ে ফেলার সময় যে গ্যাস নির্গত হ'ল, তার মধ্যে প্রচুর কার্বন থাকে। সেই কার্বন ক্রমাগত বায়ুমণ্ডলে জমা পড়তে লাগলো। বায়ুমণ্ডলে যত কার্বন ডাইঅক্সাইড বৃদ্ধি হয়, বায়ুমণ্ডল তত উত্তপ্ত হয়। এই কারণেই বর্তমানে বায়ুমণ্ডল ক্রমাগত অধিক উত্তপ্ত হয়ে পড়ছে।

রুজি রোজগারের আশায় শুধু বন জঙ্গল কেন, জমির উপর আচ্ছাদনকারী ঘাসও রেহাই পায় না। গবাদি পশুর খাদ্য হিসাবে সমূলে সেই ঘাস প্রতিদিন মাটি থেকে তুলে নেওয়া হচ্ছে। মাটির উপরের এই আচ্ছাদন মাটিকে অবক্ষয়ের হাত থেকে রক্ষা করতো। মাটির নীচের জল ধরে রাখতে সাহায্য করতো। বায়ুমণ্ডলের উত্তাপ এখন সরাসরি আচ্ছাদনহীন মাটিকে স্পর্শ করে। মাটি ক্রমাগত শুকিয়ে যাচ্ছে। উত্তপ্ত বায়ুমণ্ডল বছরের অনেক খানিই ঝোড়ো বাতাসের সঞ্চার করে। এই বায়ু প্রবাহের আঘাতে শুকনো মাটি ধুলিকণায় পরিণত হয়ে বাতাসের সঙ্গে মিশে প্রবাহিত হয়ে চলে

যাচ্ছে। এইভাবে বায়ুমণ্ডলের প্রবাহে ভূমির অবক্ষয় চলছে। তারপর যখন বৃষ্টি নামছে, তখন সেই আচ্ছাদনহীন মাটি জলের সঙ্গে মিশে নদীর বুকে এসে পড়ছে। নদীর বুকের পলি বৃদ্ধি পাচ্ছে। নদীর জল ধারণ ক্ষমতা না থাকায়, নদী নিজের পথ ছেড়ে অন্য পথে প্রবাহিত হচ্ছে। নদী নিজের পাড় ভেঙ্গে, পাড়ের মাটি নিজের বুকে ফেলছে। এইভাবে ক্রমাগত নদীগুলির বিকৃতি ঘটছে। কারণগুলি অনেক দূরে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি, দারিদ্র্য, বন জঙ্গল উচ্ছেদ, বায়ুমণ্ডলের পরিবর্তন, বৃষ্টিপাত হ্রাস, ভূমির অবক্ষয়, নদীর নাব্যতাহ্রাস—সব কিছুর প্রভাব এসে পড়ছে নদীগুলির উপর। হাজার হাজার গ্রামবাসীর জীবন রেখা হ'ল এই নদী। শুধু দূষণ নয়, ভারসাম্যের অভাবে নদীগুলি এখন বিলুপ্তির মুখে। নদী এখন ক্রমেই ডাঙ্গায় পরিণত হতে চলেছে।

প্রতিরোধ গড়ে তুলুন

দূষিত জলের মাছ, ক্ষেত খামারের দূষিত শস্য, শাকসবজি বাজার ঘুরে রান্নাঘরে প্রবেশ করে। ভবিষ্যতের নাগরিক প্রিয় শিশুদের মুখে আমরা তা তুলে দিই। যাদের সবচেয়ে বেশী ভাল-বাসি, ধীরে ধীরে তাদের শরীরে বিষ প্রয়োগ করি। তাদের স্বাস্থ্যহানি করি। শিশুদের দেহ ও মস্তিষ্ক গঠনে বাধা দিই। এখনও পানীয় জল পাওয়া যাচ্ছে। হয়ত এমন দিন আসবে যখন কোন জলই নির্বিঘ্নে পানীয় জল রূপে ব্যবহার করা যাবে না তখন পানীয় জলকে দূষণমুক্ত করতে এত খরচ হবে যে তা সাধারণ মানুষের ক্ষমতার অনেক বাইরে চলে যাবে। জল সম্পদ সবার জীবন রক্ষা করে। সেই জলকে দূষণমুক্ত রাখতে আমরা কতটুকু করি। জলের নাম জীবন। কিন্তু আমাদের অজান্তেই জলকে জীবন-নাশক করেছি। জলকে নদীর বুকে দূষণ-মুক্ত করে ধরে রেখে জনজীবনের কাজে ব্যবহার না করে, জলকে

বন্যায় তাণ্ডব করতে দিয়েছি। হাজার হাজার গ্রামবাসীর জীবন নষ্ট করতে দিয়েছি। চোখের সামনে জলকে দূষিত হ'তে দেখলে, নির্বিকারে সরে গেছি। একটুও বিচলিত হইনি। ভেবেছি, এ আমার কাজ নয়। আমার করারই বা কি আছে? আমার কতটুকু ক্ষমতা? কিন্তু আমি আমার শিশুর কথা কি ভেবেছি? আমি আমার সেই প্রিয়জনদের কথা কি ভেবেছি, যাদের শরীরে জল দূষণের প্রভাব পড়ছে? একজন জলদূষণ করবে, আর তার প্রভাবে আমার শিশুরা ক্রমাগত বিকলাঙ্গ হবে, আর আমি নির্বিকারে তা' শুধু দাঁড়িয়ে দেখবো? আমার কি কিছুই করার নেই?

আমরা যে যাই হই না কেন, আমাদের সবার এ বিষয়ে করণীয় আছে। জলের নাম জীবন। জল সকলের সম্পদ। জলের উপর সকলের সমান অধিকার। তাই জলকে জীবননাশক হতে দেব না। জলকে দূষিত করতে দেব না। যাঁরা জল দূষণ করেন, তাঁদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলবো। সমগ্র জনশক্তি দিয়ে সবার জলসম্পদ দূষণমুক্ত রেখে শিশুদের সুস্থ সবল নাগরিক করে গড়ে তুলবো।

□

গঙ্গা নদীর দূষণ ও প্রতিকার

কণকরঞ্জন সমাদ্দার

গঙ্গা ভারত তথা পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ নদী। পৌরাণিক মতে ভগীরথ গঙ্গাকে মর্তে আনেন বলে অপর নাম ভাগীরথী। মধ্যহিমালয়ের তুষারমৌলি ভাগীরথী শিখরত্রয়ের পশ্চাৎপটে চার হাজার মিটার উঁচু গোমুখের মত আকৃতি বিশিষ্ট বরফাচ্ছন্ন অন্ধকার গুহামুখ থেকে এর উৎপত্তি। শুরুতে কলস্বনা নির্ঝরিণী। গোমুখ থেকে প্রায় ৫০০ কিমি পার্বত্য পথের শেষে হৃষিকেশে এসে সমতল ভূমিতে গঙ্গার অবতরণ হয়েছে। নদী এখানে বিশাল এবং প্রবল স্রোতবতী। হৃষিকেশ থেকে বঙ্গোপসাগর দীর্ঘ ২০০০ কিমি যাত্রাপথের দুই তীরে আছে অনেক শহর বহুজনপদ এবং অসংখ্য মানুষের বসতি। বহু গল্পগাথা, পৌরাণিক কাহিনী এবং মানুষের বিশ্বাস, আশা ও আকাঙ্ক্ষার মূর্ত্তপ্রতীক গঙ্গা।

ভারতীয় হিন্দুদের কাছে গঙ্গা অতি পবিত্র নদী। গঙ্গাকে পতিতপাবনী কলুষনাশিনী রূপে পূজা করা হয়। হিন্দুদের ধর্মীয় উপাচারের অন্যতম উপকরণ গঙ্গাজল। গঙ্গা হিন্দুর সংস্কৃতি ও ধর্মের মধ্যে মিলেমিশে গিয়েছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে নানা লোকগাথা এবং অন্যান্য সংস্কার।

জাতীয় জীবনে গঙ্গার ভূমিকা

গঙ্গার জলরাশির মোট ৬০ শতাংশ আসে এর উপনদীগুলি থেকে। পার্বত্য অঞ্চলে অলকানন্দা, মন্দাকিনী। সমতলভূমি অঞ্চলে রামগঙ্গা, যমুনা, শোন, গোমতী, খাগড়া, গণ্ডক, বুড়িগণ্ডক এবং কোলি। এদের জলধারা গঙ্গাকে করেছে প্রবল বেগবতী। উপনদী সমেত গঙ্গা বিধৌত অঞ্চলগুলিকে বলা হয় গাঙ্গেয় উপত্যকা। গঙ্গা এই উপত্যকা অঞ্চলের সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং সংস্কৃতির ধারক ও বাহক এবং "প্রাণ প্রবাহ" স্বরূপ।

ধর্মীয় সংস্কার ও বিশ্বাস ছাড়াও, গঙ্গার অর্থনৈতিক ও সামাজিক গুরুত্ব অপরিসীম। ভারতের শতকরা ৩৭ ভাগ লোকের বাস গাঙ্গেয় উপত্যকায়। সমীক্ষায় প্রকাশ আমাদের দেশের মোট জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশ জীবিকা ও জীবনের জন্য গঙ্গার উপর নির্ভরশীল। মোট ৮ টি রাজ্য—হরিয়ানা, উত্তর প্রদেশ, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, হিমাচল প্রদেশ এবং দিল্লী—প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে গঙ্গার উপর নির্ভরশীল। ভারতে সেচযুক্ত জমির শতকরা ৪৭ ভাগ গাঙ্গেয় উপত্যকায় অবস্থিত। জমি খুবই উর্বরা। ঋতুতে ঋতুতে হয় নানা ফসলের উৎপাদন। অপর্যাপ্ত হয় ধান, গম, আখ তুলা, পাট, ফল ও শব্জী। গঙ্গার তীরভূমি চিরশস্য-শ্যামলা। নদী এখানে যথার্থ জীবনদায়িনী এবং প্রাণপ্রবাহ স্বরূপ।

হৃষিকেশ থেকে সাগর এই দীর্ঘ ২০০০ কিমি জলধারা থেকে পাই নানা মাছ যেমন ট্রাউট, রুই, কাতলা, আড়, বোয়াল এবং ইলিস। পর্য্যাপ্ত পাওয়া যায় চিংড়ি, কাঁকড়া কচ্ছপ এবং ডলফিন জাতীয় প্রাণী। দরিদ্রদেশে পর্য্যাপ্ত আমিষ খাদ্যের যোগান দেয় গঙ্গা। এর দুই তীরে কয়েক লক্ষ মৎস্যজীবীর বাস।

অতি প্রাচীনকাল থেকেই গঙ্গার জলের পবিত্রতা, শুদ্ধতা ও পেয়গুণ সম্পর্কে একটি গভীর বিশ্বাস প্রচলিত আছে। ঐতিহাসিক আবুল ফজল লিখেছেন যে সম্রাট আকবর গঙ্গার জল পান করতেন। এই জল আহরণ ও দিল্লীতে সংরক্ষণ করার জন্য তিনি একটি স্বতন্ত্র "জল বিভাগ" স্থাপন করেছিলেন। পরবর্তী সম্রাট জাহাঙ্গীর, শাহজাহান এবং ঔরংজেব সকলেই গঙ্গার জল পান করতেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন যে ঠাকুরবাড়িতে বড় বড় জালা ভর্ত্তি করে সারা বছরের পানের জন্য গঙ্গার জল সঞ্চয় করে রাখা হোত।

সভ্যতার প্রসার—বিশেষ করে যন্ত্র সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে গঙ্গার দুই তীরে গড়ে উঠেছে নানা কলকারখানা, গড়ে উঠেছে অসংখ্য নগর ও জনপদ। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলশ্রুতি হল গাঙ্গেয় উপত্যকার অতি ঘনবসতি। বর্তমানে সারাভারতের শহরবাসী মানুষের এক-তৃতীয়াংশ গাঙ্গেয় উপত্যকার শহরগুলিতে বাস করে। দেশের মোট ২৩০০ টি শহরের ৬৯২ টি আছে গাঙ্গেয় উপত্যকায়। গঙ্গার তীরেই আছে—প্রায় ১০০টি শহর, যার মধ্যে ২৭টির লোক সংখ্যা ১ লক্ষেরও বেশী। এক কলকাতা শহরেই ৯০ লক্ষ লোকের বাস। কানপুরে ১৭ লক্ষ এবং পাটনা ও বারাণসীতে আছে—১০ লক্ষেরও বেশী লোক, সভ্যতার এই অগ্রগতির সঙ্গে নদী দূষণের যোগসূত্র প্রত্যক্ষ এবং নিবিড়। এই বিশাল জনসংখ্যার প্রয়োজনের তাগিদে বর্তমানে গঙ্গা আর সুপেয, বিশুদ্ধ জলের আকার নয় এখন এটি একটি বৃহৎ নর্দমায় পর্যবসিত হয়েছে। সমস্ত জনপদ, সমস্ত কলকার-খানার আবর্জনা ও কলুষরাশি নির্বিচারে গঙ্গায় ফেলা হচ্ছে। ফলে নদীর জল ভয়ঙ্কর রূপে দূষিত হয়েছে।

পৌরাণিক গাথামতে সমুদ্রমন্থনের ফলে যে অমৃতকুণ্ড উঠেছিল এবং সেই কুণ্ড যখন ইন্দ্রপুত্র অসুরদের থেকে দূরে সরিয়ে রাখ-

ছিলেন তখন অমৃতবিন্দু পড়েছিল হরিদ্বার ও প্রয়াগে, সেই থেকে 'গঙ্গার জল অমৃতসমান এই বিশ্বাসের উৎপত্তি। বর্তমানে কিন্তু গঙ্গার জল দূষণের ফলে অতি নিকৃষ্ট হয়েছে। আন্তর্জাতিক মান হিসাবে গঙ্গা D অর্থাৎ চতুর্থ শ্রেণীর নদী। দূষণহীন নদীকে A জাতীয় নদী বলা হয়।

দূষণ কি এবং কিভাবে হয়?

দূষণের পরিমাপের জন্য গঙ্গাকে পার্বত্যগঙ্গা, সমতলগঙ্গা এবং নিম্নগঙ্গা এই তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে। পার্বত্যগঙ্গার বিস্তার গোমুখ থেকে হৃষিকেশ। মধ্যগঙ্গা হৃষিকেশ থেকে ফারাক্কা এবং ফারাক্কা থেকে মোহানা হল নিম্নগঙ্গা।

এই তিন অঞ্চলেরই দূষণের মূল কারণ হল দুটি : ১) মানুষের মল, মূত্র এবং ঐ জাতীয় আবর্জনা এবং ২) কলকারখানার নানা বর্জ্য পদার্থ এবং কলুষ।

পার্বত্য গঙ্গার দুধারে কলকারখানা নেই সুতরাং সেখানে দূষণ মূলতঃ মানুষের মলমূত্র-জাত। ভারতবর্ষের অধিকাংশ গ্রামাঞ্চলে পায়-খানার বন্দোবস্ত নেই। গঙ্গার তীরবর্তী মানুষের মলমূত্র ত্যাগের অবশ্যম্ভাবী ফল এই আপাতঃ সুনীল স্বচ্ছ জলরাশিতে মানুষের আন্ত্রিকরোগক্ষমতাসম্পন্ন নানা জীবাণুর অবস্থিতি। আন্তর্জাতিক মানানুসারে প্রতি ১০০ মিলি জলে আন্ত্রিক জীবাণু যদি ১ বা ১ এর কম হয় তবে সে জল পেয়, যদি ১০ বা কম হয় তাহলে স্নানযোগ্য। যদি ১০০র বেশী হয় তাহলে অতিদূষিত বলে গণ্য হয়। সমীক্ষা অনুসারে পার্বত্যগঙ্গার জল স্নানযোগ্য কিন্তু পেয় নয়।

সমতলভূমির গঙ্গার জল শহরবিশেষে অতিদূষিত কারণ এখানে শহরের সমস্ত দূষিত জল মলমূত্র আবর্জনা ফেলা হয় গঙ্গার

জলে। হিসাবে দেখা গিয়েছে যে প্রতিদিন ৯০ কোটি লিটার পৌর আবর্জনা গঙ্গায় ফেলা হয়। এ ছাড়াও অসংখ্য জনবসতির সমস্ত আবর্জনা এবং মলমূত্রও নর্দমা দিয়ে গঙ্গায় ফেলা হয়। গঙ্গার তীরে কলকারখানা গুলি জলের প্রয়োজনেই গড়ে উঠেছে। কাঁচা-মাল জলপথে পরিবহন সুলভ। প্রায় সব কলকারখানায় জল অন্যতম প্রধান উপাদান। কলকারখানার দূষিত রাসায়নিক বর্জ্য পদার্থ নিষ্কাশনও অতিসহজে হয় নদীতে ফেলে দিলে। গঙ্গার তীরবর্তী লক্ষ লক্ষ কলকারখানার সমস্ত বর্জ্য পদার্থই ফেলা হয় গঙ্গায়। বর্তমানে এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কীট ও ছত্রাকনাশক ঔষধের দূষণ। গাঙ্গেয় উপত্যকায় কৃষির উন্নতির অন্যতম প্রধান কারণ পর্য্যাপ্ত কীট ও ছত্রাকনাশক দ্রব্যের ব্যবহার। এইগুলি অধিক ফলনে সাহায্য করলেও মাটিতে জমে থাকে এবং বর্ষার জলে ধুয়ে গঙ্গায় গিয়ে পড়ে। এই রাসায়নিক দ্রব্যগুলির অধিকাংশই অতি মারাত্মক বিষ এবং অনেকেই ক্যান্সার উৎপন্ন করে।

গঙ্গা কলুষনাশিনী এই ধারণাবলে এবং অন্যব্যবস্থা না থাকায়, হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে অধিকাংশ ভারতবাসীই পশুর মৃতদেহ গঙ্গা বা নিকটবর্তী নদীতে ফেলে দেয়। গঙ্গা তীরে মলমূত্র ত্যাগ, সারা ভারতব্যাপী সাধারণ অভ্যাস।

নিম্নগঙ্গায় জনবসতি সবচেয়ে ঘন এবং কলকারখানার সংখ্যাও সবচেয়ে বেশী সুতরাং মলমূত্র জাত জীবাণু এবং কারখানা জাত রাসায়নিক দূষণ সর্বাধিক। কল্যানী বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক দল সম্প্রতি একটি সমীক্ষায় দেখেছেন যে কাটোয়া থেকে নৈহাটী এই প্রায় ১০০ কিমি পথের সর্বত্র জীবাণু দূষণ ঋতু নির্বিশেষে প্রতি ১০০ মিলি জলে গড়ে প্রায় ১০০০। আন্তর্জাতিক মানানুসারে এই জল স্পর্শ করাও উচিত নয়। বিশেষ উদ্বেগের কথা এই যে এই সমীক্ষক দল দেখেছেন যে এই জলে কলেরা, কোলাই, আমাশয়, এবং আন্ত্রিক

রোগের জীবাণু পর্য্যাপ্ত আছে। আরো চিন্তার কথা এই যে এদের অধিকাংশই বর্তমানে যে সব এ্যান্টিবায়োটিক বা অন্যান্য ওষুধ চিকিৎসার জন্য ব্যবহার হয় সেগুলি প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন। অর্থাৎ গঙ্গার জলে স্নান করলে বা ব্যবহার করলে এদের রোগের সম্ভাবনা আছে এবং বর্তমানে ব্যবহৃত ওষুধ গুলি রোগ নিরাময়ে ব্যর্থ হতে পারে।

গঙ্গা জল দূষণের আর একটি প্রধান কারণ হল মাটির কণা। গঙ্গার তীরবর্তী সমস্ত বনজঙ্গল, গাছপালা এমন কি খাল পর্যন্ত আমরা নির্বিচারে উজার করে ব্যবহার করেছি। ফলে তীরভূমির মাটি উন্মুক্ত। বর্ষায় এই মাটি ধুয়ে গঙ্গায় পড়ে জল কর্দমাক্ত হয়। পলিমাটিযুক্ত ঘোলা জলে সূর্যালোক যথেষ্ট প্রবেশ করতে পারে না বলে জলজ উদ্ভিদ বিশেষ হয় না। খাদ্যশৃঙ্খলের প্রথমটির অভাবে ক্রমে পোকা, মাকড়, মাছ, কচ্ছপ, শুশুক কিছুই হয় না, নদীর উৎপাদিকা শক্তি ক্রমে ক্ষীণ হয়। পালিমাটিতে নদীর খাত বুঁজে যায়, ফলে জলের ধারণক্ষমতা কমে যায় এবং পরিণামে হয় প্রবল বন্যা। সুতরাং একটি নদীর স্বাস্থ্য নানা কারণে ব্যাহত হতে পারে। আর্থ-সামাজিক, ধর্মীয় ও শিক্ষাগত সব কারণগুলিরই গভীরে উপলব্ধি না হলে নদী দূষণের গভীরতা ও ব্যাপ্তি আমাদের বোধগম্য হবে না।

প্রতিকারের পন্থা

গঙ্গা দূষণের প্রধান কারণ শহর গুলির আবর্জনা। নিম্ন-গঙ্গায় নবদ্বীপ থেকে বজবজ প্রায় সাড়ে চারশটি নালীমুখে শহরের সব আবর্জনা গঙ্গায় ফেলা হয়। গঙ্গায় শহরের আবর্জনা ফেলা বন্ধ করা প্রধান কর্তব্য। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার যৌথ ভাবে গঙ্গাতীরবর্তী শহরগুলি আবর্জনা শোধন করার

আধুনিক ব্যবস্থাদি গ্রহণ করার উদ্যোগ নিয়েছেন—গঙ্গা এ্যাকসন প্লান। গঙ্গাতীরবর্তী ২৭টি প্রথম শ্রেণীর শহরের আবর্জনা গঙ্গায় না ফেলে পরিশোধনের জন্য ৩০০ কোটি টাকার বরাদ্দ করেছেন। এতে প্রায় শতকরা ৭৫ ভাগ জীবাণুদূষণ রোধ করা যাবে।

কলকারখানাজাত রাসায়নিক বর্জ্যপদার্থজনিত দূষণের পরিমাণ শতকরা ২৫ ভাগ। উন্নত দেশ গুলিতে যেমন আমেরিকা, রাশিয়া এবং ইংল্যাণ্ড, কলকারখানার বর্জ্য পদার্থ কখনই সরাসরি নদীতে ফেলা হয় না—শোধন করা হয়। আমাদের দেশেও এই ব্যাপারে নানা বিধিনিষেধ এবং আইন আছে। কিন্তু সম্পদ-ও প্রভাবশালী মালিক গোষ্ঠী এই সব আইন অমান্য করে এবং কোন দণ্ড হয় না। সরকারী তরফে কঠোর হাতে কারখানাজাত দূষণ প্রতিরোধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

সাধারণ ভারতবাসী হিসাবে আমাদের কিছু বর্তব্য আছে—সেগুলি হল ঃ ১) গঙ্গার তীরে মলমূত্র ত্যাগ না করা।
২) আবর্জনারাশি গঙ্গায় না ফেলা।
৩) জন্তুর মৃতদেহ না ফেলা।
৪) জনপদের নর্দমাগুলি গঙ্গায় মুক্ত না করা এবং
৫) শিক্ষার মাধ্যমে দূষণ বিরোধী জনমত জাগ্রত করা।

পরিশেষে বলব যে, সুপ্রাচীন মহেঞ্জোদোড়ো এবং হরপ্পা গড়ে উঠেছিল নদীর ধারে। নগরবাসীরা কিন্তু আবর্জনা নদীতে ফেলত না। প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে দেখা গেছে যে সমস্ত নর্দমাবাহিত আবর্জনা জমা হত শহর থেকে দূরে নদীর বিপরীত দিকে প্রান্তরে বড় বড় কূয়োর মধ্যে। একটি কূয়ো ভরাট হলে নতুন কূয়ো খোঁড়া হত। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে লিখেছে নদীর জল বিশুদ্ধ রাখতে নদীকে

মাতার মত জ্ঞান করবে—এবং ১৩টি বিধান দেওয়া আছে। পূজা আচার ছাড়াও আমাদের প্রথম চারটি বিধানও কিন্তু ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের লেখক লিখে রেখে গেছেন। আধুনিক বৈজ্ঞানিক বিধান বা পৌরাণিক বিধান যে ভাবেই হোক—গঙ্গাকে দূষণমুক্ত করা আমাদের আর্থ-সামাজিক উন্নতির একটি প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত। দূষণমুক্ত গঙ্গা যথার্থই প্রাণদায়িনী এবং মাতৃরূপা।

□

বায়ুদূষণের একটি ভয়াবহ দিক—অ্যাসিড বৃষ্টি

শঙ্কর নারায়ণ সিন্‌হা

দূষণ কথাটি বর্ত্তমানে কারও কাছে অজানা নয়। এই পৃথিবীর জল, মাটি, বাতাস নানাভাবে প্রতিনিয়ত দূষিত হচ্ছে, ফলে সমগ্র জীবজগতের অস্তিত্ব আজ বিপন্ন হতে চলেছে। দ্রুত শিল্পবিস্তার, নূতন নূতন শহর এবং নগরের পত্তন বিভিন্ন ভাবে বায়ুকে অনবরত দূষিত করে চলেছে, যার একটি ভয়াবহ দিক হ'ল অ্যাসিড বৃষ্টি। বিশ্বের বিভিন্ন শিল্পসমৃদ্ধ শহরাঞ্চলে এটা একটা বিরাট সমস্যা, যা বিভিন্ন জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংস্থা, দেশ-বিদেশের পরিবেশবিজ্ঞানীর এবং সর্বস্তরের সাধারণ মানুষের কাছে একটি উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

অ্যাসিড বৃষ্টি কি ?

এখন স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে যে এই অ্যাসিড বৃষ্টি কি ? আমরা দেখেছি যে, বিগলন চুল্লী এবং মোটরগাড়ী চলাকালীন নির্গত পদার্থ থেকে সাধারণতঃ সালফার এবং নাইট্রোজেনের বিভিন্ন অক্সাইড উৎপন্ন হয়। এই সমস্ত অক্সাইডগুলি কারখানার লম্বা

চিমনীর মধ্য দিয়ে ৪০০ মিটার বা তারও উঁচুতে বাতাসে মিশে যায় এবং এর পর বাতাসে তারা কয়েক হাজার কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে। পৃথিবীতে ফিরে আসার আগে যত বেশী সময় ধরে অক্সাইডগুলি বাতাসে থাকে, ততবেশী তারা জারিত হয়ে সাল-ফিউরিক এবং নাইট্রিক অ্যাসিডে পরিবর্তিত হয়ে যায় এবং যখন তারা জলের সাথে বৃষ্টিরূপে মাটিতে পড়ে, তখনি তাকে আমরা 'অ্যাসিড বৃষ্টি' বলে থাকি। সালফিউরিক এবং নাইট্রিক—এই দুটি অ্যাসিডই হ'ল অ্যাসিড বৃষ্টির মুখ্য দুটি উপাদান।

অ্যাসিড বৃষ্টির ফল

অ্যাসিড বৃষ্টি মাটির অম্লতা বৃদ্ধি করে এবং বিভিন্ন জীবের উপর এর প্রভাব বেশ ক্ষতিকর, অ্যাসিড বৃষ্টির ফলে বনাঞ্চল এবং শস্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, যার দরুণ কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতা হ্রাস পায়। এছাড়াও এই বৃষ্টি পাকা ঘরবাড়ী, স্মৃতিসৌধ, মূর্ত্তি, সেতু এবং তৎসংলগ্ন রেলিং প্রভৃতি ক্ষয় করে। এর ফলে বিশ্বে প্রতিবছর প্রায় ১৪৫ কোটি ডলার ক্ষতি হয়। অ্যাসিড বৃষ্টির ফলে সেণ্ট পলস্ ক্যাথিড্রালের পাথরের কাজ এবং ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট ভবন বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে (দি টাইমস্ অফ ইণ্ডিয়া, ২৫শে অক্টোবর, ১৯৮৬)। অ্যাসিড বৃষ্টি পানীয় জল এবং খাদ্য দ্রব্যকেও নষ্ট করে।

অ্যাসিড বৃষ্টির ফলে বিভিন্ন ভারী ধাতু (heavy metal) এক স্থান থেকে অন্য স্থানে পরিবাহিত হয়ে থাকে। যেমন, শিলা বা মৃত্তিকা-স্থিত ক্যালসিয়াম, পারদ প্রভৃতি বৃষ্টির জলে ধৌত হয়ে বিভিন্ন জলাধারে প্রবেশ করে। অ্যাসিডযুক্ত হ্রদে অতিরিক্ত ভারী ধাতুর উপস্থিতি জীবন্ত কোষকে মেরে ফেলতে পারে এবং মাছের মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

এ তো গেল অ্যাসিড বৃষ্টির বিভিন্ন ক্ষতির একটি সাধারণ চিত্র।

এর ভয়াবহতা যে আরও কতখানি তা কয়েকটি দৃষ্টান্ত থেকে আমরা সহজেই বুঝতে পারব। অ্যাসিড বৃষ্টির ফলে নিউইয়র্ক শহরে ২০০-র বেশী হ্রদ নষ্ট হয়ে গেছে। সুইডেনের প্রায় ৯০০০ এবং নরওয়ের প্রায় ১৫০০ হ্রদ এখন মৎস্যবিহীন। এই সমস্ত মৎস্যবিহীন অঞ্চলগুলোকে এখন বলা হয়ে থাকে 'ফিস্ গ্রেভ্ ইয়ার্ড'।

পশ্চিম জার্মানীর বনাঞ্চলের আট শতাংশ এই অ্যাসিড বৃষ্টির ফলে নষ্ট হয়ে গিয়েছে, যার ক্ষতির পরিমাণ হ'ল একশ কোটি ডলার। এনভাইরনমেণ্টাল সায়েন্স এণ্ড টেক্‌নোলজীর একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে সুইজারল্যাণ্ড, নেদারল্যাণ্ড এবং চেকোশ্লোভাকিয়ার সমস্ত বনাঞ্চল অ্যাসিডবৃষ্টির ফলে নষ্ট হয়ে গিয়েছে। (দি টাইমস্ অফ ইণ্ডিয়া, ২৫ জুন ১৯৮৬)।

ব্রিটেন, মধ্যইউরোপ এবং দক্ষিণ স্ক্যান্‌ডিনাভিয়াতে অ্যাসিড বৃষ্টির প্রভাব খুবই মারাত্মক। একটি ব্রিটিশ সাপ্তাহিকীর একটি সংখ্যার (২৭ অক্টোবর, ১৯৮৬) প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, ইউরোপের যে কোনো দেশের চাইতে ব্রিটেনে সবচেয়ে বেশী সালফারডাইঅক্সাইড বাতাসে নির্গত হয়। স্কট্‌ল্যাণ্ডে ১৯৭৪ সালে যে অ্যাসিড বৃষ্টি হয়েছিল, সেটা ভিনিগারের থেকেও বেশী টক ছিল [পি এইচ (p^H)=২'৪] এই সালফিউরিক অ্যাসিড বর্ষণ সাধারণ বৃষ্টির চাইতে বেশী আম্লিক ছিল, বেশীর ভাগ বরফ, যেটা ব্রিটেনে পড়েছে তা এখন খুবই আম্লিক। এই বরফ যদি এখনি না গলে, তাহলে অবজারভার পত্রিকার মতে এটা ভবিষ্যতে একটি 'পল্যুশন টাইম বোমা'-য় পরিণত হবে। ওয়েলস্ এর তাওয়াই নদী এত আম্লিক যে কোনো মাছ আর সেখানে নেই।

অ্যাসিড বৃষ্টির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিকটি হ'ল এই যে, দোষী থাকে এক দেশে এক স্থানে আর দোষের শাস্তি পায় অন্য দেশের

লোক, কারণ বিভিন্ন দূষকগুলি বায়ুপ্রবাহের সাথে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যায় এবং সেখানেই বৃষ্টির জলের সাথে মাটিতে পড়ে। অ্যাসিড বৃষ্টির ফলে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সুইডেন এবং কানাডা। কানাডায় অ্যাসিড বৃষ্টি আসে প্রধানতঃ উত্তর আমেরিকার একটি পেট্রোকেমিক্যাল প্ল্যান্ট্ থেকে, আর সুইডেনে অ্যাসিড বৃষ্টি হয় ব্রিটেন এবং ফ্রান্সের কারখানা জাত পদার্থ থেকে। এর ফলে সুইডেনে উদ্ভিদের বৃদ্ধি প্রায় পনের শতাংশ কমে গেছে (সুইডিশ্ সায়েন্স অ্যাকাডেমীর একটি পত্রিকায় প্রকাশিত)। একই ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে নরওয়ে, ডেনমার্ক এবং পশ্চিম জার্মানীর মত বড় বড় দেশ (দি টাইমস অফ ইণ্ডিয়া, ২৫শে জুন, ১৯৮৬)।

ভারতে অ্যাসিড্ বৃষ্টি

দিল্লী, বম্বে, নাগপুর, পুণা, কলকাতা প্রভৃতি কয়েকটি শিল্প-নগরীর বৃষ্টির জলের পি. এইচ. পরীক্ষা করে কিছুটা আম্লিকতা লক্ষ্য করা গেছে। দিল্লীর জহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ভার্সনে-র মতে প্রতিবছর বাতাসে প্রচুর পরিমাণে সালফার ডাই-অক্সাইউ নির্গত হয় প্রধানতঃ 'কোল-ফাইনড্ পাউডারড্ প্ল্যাণ্ট' এবং 'পেট্রোলিয়াম রিফাইনারী' থেকে। ভাবা পরমাণু গবেষনা সংস্থার (BARC) এয়ার মনিটরিং সেকশনের বিজ্ঞানী ডক্টর ডি. এন কেলকারের মতে, বম্বের বাতাসে অ্যাসিডের পরিমাণ ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে ফলে অ্যাসিড বৃষ্টি সেখানে একটি সমস্যা হয়ে উঠতে চলেছে। BARC-র একটি সমীক্ষায় প্রকাশিত ভারতের কয়েকটি শহরের অ্যাসিড বৃষ্টির ফলে পি. এইচ.-র মান নীচে দেওয়া হ'ল।

শহর	পি. এইচ
দিল্লী	৬.২১
মাদ্রাজ	৫.৮৫
কলকাতা	৫.৮০
বম্বে	৪.৮০

প্রতিকারের সম্ভাবনা

অ্যাসিড বৃষ্টির ভয়াবহতার দিকগুলো আমরা এখন অনেকটা বুঝতে পারলাম। যদিও ভারতবর্ষের বিভিন্ন শিল্পসমৃদ্ধ শহরগুলিতে এর ক্ষতিকারক প্রভাব এখনও খুব একটা হতাশা ব্যঞ্জক নয় একমাত্র বম্বে ছাড়া, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এ সমস্যা আজ ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। কিন্তু আগেই বলা হয়েছে যে, যদি কোন স্থানে কোন শিল্প নাও থাকে, তা সত্ত্বেও সেই স্থানে অ্যাসিড বৃষ্টির সম্ভাবনা থেকে যায়। কাজেই এই সমস্যাটা সমস্ত বিশ্বজুড়ে এবং বিশ্বের যে কোনো স্থানেই হোক না কেন সমস্ত মানুষকেই এর প্রতিকারের উপায় ভাবতে হবে। যদিও এই অ্যাসিডবৃষ্টি দু-শতাব্দীরও বেশী সময় ধরে চলে আসছে, বিজ্ঞানীমহলে সাড়া জাগিয়েছে খুবই সম্প্রতি। প্রথম দিকে, শিল্পক্ষেত্রে, বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোতে অ্যাসিডবৃষ্টি বন্ধ করতে খুব লম্বা চিমনী তৈরী করার প্রস্তাব রাখা হয়েছিল, কিন্তু এতে খুব একটা সুবিধা হয় নি। আসল কথা হ'ল, অ্যাসিড-বৃষ্টি তখনই বন্ধ করা যাবে যখন আমরা বাতাসে বিভিন্ন বায়ুদূষণের পরিমাণ কমাতে পারব। বর্তমানে শিল্পক্ষেত্রে স্ক্রাবার নামক একটি যন্ত্রের খুবই ব্যবহার হচ্ছে যার সাহায্যে চিমনী থেকে নির্গত বিভিন্ন গ্যাসের মধ্য থেকে দূষক গ্যাসগুলোকে খুব সহজেই সরিয়ে ফেলা যায়। এছাড়াও শিল্পক্ষেত্রে বর্তমানে জীবাশ্ম জ্বালানীর পরিবর্তে বিকল্প জ্বালানীর ব্যবহারের কথা ভাবা হচ্ছে; ফলে অ্যাসিড বৃষ্টির প্রভাব থেকে অনেকটাই মুক্তি পাওয়া যাবে।

□

চাই, শুভবুদ্ধি

শ্যামাপদ সেন

পরিবেশ ও জীবনের সম্পর্ক

জীবন পরিবেশের সৃষ্টি। ৩৫০ কোটি বছর আগে পৃথিবীর পরিবেশের বিশেষ এক অবস্থায় জীবের জন্ম। প্রসবের সেইমুহূর্তে বাতাসে কোন অক্সিজেন ছিলনা, ছিল প্রচুর কার্বনডাইঅক্সাইড, এ্যামোনিয়া, মিথেন ও হাইড্রোজেন, ছিল প্রচুর অতিবেগুনি রশ্মি ও তেজস্ক্রিয় শক্তির বিকীরণ, বাতাস ছিল খুবই উত্তপ্ত। এর কোনটাই জীবের বৃদ্ধি ও প্রসারের অনুকূল নয়, আজ অতীতের সেইমাত্রা আবার যদি কোন কারণে ফিরে আসে, জীবজগতের বিলুপ্তি ত্বরান্বিত হবে। ৪০০ কোটি বছরে পৃথিবীর পরিবেশের অনেক পরিরর্তন হয়েছে। সেই পরিবর্তনের চরম ফলশ্রুতি মানুষের আবির্ভাব বিবর্তনের সাম্প্রতিকতম সৃষ্টি। কিন্তু এই সৃষ্টির অস্তিত্ব সাম্যাবস্থার অতি সূক্ষ্ম একটি সূতায় অবস্থান করছে। এই সাম্যাবস্থার মাত্রাতিরিক্ত ব্যক্তিক্রম বহুজীবের অস্তিত্ব বিপন্ন করবে, অনেকেই অবলুপ্ত হয়ে যাবে।

পরিবেশ দূষণ আপেক্ষিক। এই দূষণ চিরকালই ছিল, তবে ভিন্ন ভাবে। মানুষের চোখের জল, রক্তের প্রতিরোধ ক্ষমতা, নাসারন্ধ্রের কেশগুচ্ছ সবকিছুই দূষণ প্রতিরোধক। ধূলিকণা, জীবাণু

যাতে শরীরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে না পারে। এগুলির সৃষ্টি সেই জন্যই। এই ধূলিকণা ও জীবাণু আজকের পৃথিবীর অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। লক্ষ লক্ষ জীবাণু অকালে বাতাসে ধূলিকণায় ছড়িয়ে আছে, মানুষের মত তারাও পরিবেশের সৃষ্টি। ধূলিঝড় শুধু দৃষ্টি অবরুদ্ধ করে না, শ্বাসনালী ও ফুসফুসে প্রবেশ করে এদের কর্মক্ষমতা হ্রাস করিয়ে দেয়। অতীতের ডাইনোসরের আকস্মিক তিরোধান নাকি এই ধরণের ধূলিঝড়ের পরোক্ষ ফল। বাতাসে ভাসমান ধূলিকণা সূর্যালোকের উজ্জ্বলতা স্তিমিত করে, উদ্ভিদের সালোক-সংশ্লেষ প্রক্রিয়া ব্যহত করে। বহুজীবের জীবন পদ্ধতি সংখ্যা ও বিস্তৃতি এমনই যে প্রতিযোগিতা ও সঙ্ঘর্ষ অনিবার্য। জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় পার্থিব সম্পদও সীমিত। যে আবর্জনাস্তূপ আমার কাছে দূষিত পরিবেশ, ওখানে বসবাসী কীটপতঙ্গ জীবাণুদের কাছে তা-হয়ত স্বর্গরাজ্য।

পরিবেশ দূষণ কেন একটি সমস্যা

পরিবেশ দূষণ আজ একটি সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে, কেননা মানুষের নানা কর্মকাণ্ড এই প্রাকৃতিক ভারসাম্য বিঘ্নিত করেছে। শিল্পবিপ্লব যেমন একদিকে মানুষের জীবনে বিপ্লব আনে, অন্যদিকে তেমনিই দূষণের মাত্রাবৃদ্ধি করতে থাকে। যা আজ এক বিপদজ্জনক অবস্থায় এসে পৌঁছেছে। মানুষের দৈনন্দিন জীবনে এমন কতগুলি জিনিষ প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে যা জীবনধারণের পক্ষে অপরি-হার্য্য নয়। বুনোরামলালের অভিধানে তারা অকল্পনীয় শব্দসামগ্রী। ক্রমবর্ধমানজনসংখ্যা নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তুর চাহিদাও অতিমাত্রায় বাড়িয়ে দিয়েছে। এদের প্রস্তুতপ্রণালী এমনই, যে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে তা পরিবেশে কতগুলি উপাদানের মাত্রা অস্বাভাবিক বাড়িয়ে দিয়েছে, কতগুলি আবার কমতে সুরু করেছে। নতুন

এমন কতগুলি বস্তু পরিবেশের অঙ্গ হয়ে গিয়েছে, যারা অতীতে ছিলনা, যাদের জৈবিক নিয়ন্ত্রণ সম্ভব নয়, কেননা সেগুলি জৈববা মৃত্তিকারসায়নচক্রের (Geochemical cycle) অন্তর্গত নয়।

কয়েকটা উদাহরণ সমস্যার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে সাহায্য করবে। কয়লার ব্যবহার শিল্পে আজ অপরিহার্য। কয়লা ও পেট্রেলিয়াম দহনের ফলে বাতাসে কার্বনডাইঅক্সাইডের পরিমাণ গত ২০০ বছরে এত বেশি বেড়ে গিয়েছে যে বিজ্ঞানীরা চিন্তায় পড়ে গিয়েছেন। আমাদের বাতাসে এই গ্যাসের পরিমাণ মাত্র শতকরা ০.০৩ ভাগ। আমাদের শ্বাসক্রিয়ায় এই গ্যাস আমরা ত্যাগ করি, উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষ ক্রিয়ায় আবার এই গ্যাসকেই গ্রহণ করে খাদ্য বস্তুতে রূপান্তরিত করে। কিন্তু কলকারখানায় অতিমাত্রায় এই গ্যাস উৎপাদনের ফলে অদূর ভবিষ্যতে এমন এক অবস্থার সৃষ্টি হবে যখন এই গ্যাসের আচ্ছাদন পৃথিবীর তাপবিকীরণে বাধা দেবে (এটা ঐ গ্যাসের রাসায়ানিক ধর্ম), ফলে আবহাওয়ায় তাপমাত্রা বাড়বে। তাতে যদিও সালোকসংশ্লেষের পরিমাণ বাড়বে দক্ষিণমেরুর বরফ গলতে শুরু করবে, ফলে সমুদ্রে জলের পরিমাণ বাড়বে, এবং উপকূলবর্তী দেশ ও শহর যেমন মালদ্বীপ, লাক্ষাদ্বীপ বাংলাদেশের উপকূলভাগ, কলিকাতা, মাদ্রাজ, বোম্বাই জলমগ্ন হয়ে যাবে। মাত্র ১০০ বছর পরেই এ ঘটনা ঘটতে পারে।

শীততাপ নিয়ন্ত্রণের জন্য যে সব গ্যাস ব্যবহার হয়, জেট-বিমানের নির্গত গ্যাস বা রাসায়নিক ও জৈবিক ক্রিয়ায় উৎপন্ন নাইট্রোজেন অক্সাইড, বায়ুমণ্ডলের ওজনের সাথে বিক্রিয়া করে, ওজনস্তর ক্ষীণতর করছে। যদিও এখনই চিন্তিত হওয়ার কারণ নেই, তবু এগুলি যদি অব্যাহত থাকে এমনদিন আসবে, যখন এই ওজনস্তর জীবধ্বংসী অতিবেগুনি রশ্মিকে আর আটকাতে

পারবে না, ফলে অতিদ্রুত সমুদ্রের গভীরে ও মাটির নিচের জীবাণু ছাড়া সব জীবই বিলুপ্ত হয়ে যাবে। এখনই প্রতিবছর গ্রীষ্মে আন্টার্কটিকায় বায়ুস্তরের একটি ছিদ্রপথে অতি বেগুনী রশ্মি প্রবেশ করে। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য অধিক ফলনের প্রয়োজন, অধিক ফলনের জন্য নাইট্রোজেন ঘটিত সার দেওয়া অবশ্যই প্রয়োজন। এই সারের বেশ কিছু অংশকে মাটিতে এক ধরণের জীবাণু নাট্রোজেন অক্সাইডে (N_2O) রূপান্তরিত করে— যা ওজনের সাথে বিক্রিয়ার ক্ষমতা রাখে।

কলকারখানার নির্গত অন্য কয়েকটি বায়বীয় পদার্থ, যেমন সালফার ডাই অক্সাইড, ক্লোরিন, কার্বন মনক্সাইড স্বাস্থ্যের পক্ষে খুবই হানিকর। কার্বনমনক্সাইড মোটর গাড়ীর নির্গত বায়বীয় পদার্থেরও একটি অংশ। সালফার ডাইঅক্সাইড গ্যাস বাতাসে জলীয় বাষ্পের সাথে বিক্রিয়া করে অম্লবৃষ্টির (Acid rain) সৃষ্টি করে, যা তাজমহল থেকে সুরু করে বহু অট্টালিকার ক্ষতি সাধন করছে।

বিদ্যুৎশক্তির জন্য আজকাল পরমাণবিক চুল্লি ব্যবহার হচ্ছে। পরমাণবিক গবেষণা কেন্দ্রেও প্রচুর তেজস্ক্রিয় পদার্থ ব্যবহৃত হচ্ছে। বিক্রিয়ার পর বর্জ্য পদার্থ সাধারণত মাটির নিচে সমাহিত করা হয় বা সমুদ্রের জলে নিক্ষেপ করা হয়। আণবিক বোমা পরীক্ষার সময় বেশকিছু তেজস্ক্রিয় পদার্থ ধূলিকণার সাথে বায়ুমণ্ডলে ছড়িয়ে পড়ে ও পরে বৃষ্টির জলকণার সাথে পৃথিবীর মাটিতে এসে পড়ে। বিভিন্ন উদ্ভিদ মাটি থেকে এদের গ্রহণ করে। সেই উদ্ভিদ যখন গবাদি পশু আহার করে তাদের দুধে তেজস্ক্রিয় স্ট্রন্সিয়াম (^{90}Sr) ক্যালসিয়ামের স্থলে প্রবেশ করে। সেই দুধ যখন আমরা পান করি আমাদের অস্থিমজ্জায় সেই স্ট্রন্সিয়াম প্রবেশ করে। ফলে লিউকমিয়া রোগের সম্ভাবনা আসে। আকস্মিক দুর্ঘটনার ফলেও

বহু তেজস্ক্রিয় পদার্থ বায়ুমণ্ডলে ছড়িয়ে পড়ে। সাম্প্রতিককালের একটি উল্লেখযোগ্য তুর্ঘটনা রাশিয়ায় চের্নোবিল পরমাণবিক কেন্দ্রে বিস্ফোরণ। এই বিস্ফোরণ থেকে উদ্গত তেজস্ক্রিয় পদার্থ পোল্যাণ্ডে গরুর তুধে পৌঁছায়। সেই তুধ থেকে প্রস্তুত মিল্কপাউডার বাংলাদেশে বিক্রির জন্য আসে। যদিও বাংলাদেশ সরকার এই তুধের ব্যবহার নিষিদ্ধ করে, সেই তুধ ব্যবহৃত হয়েছিল কিনা জানা নেই। আণবিক বিস্ফোরণ হিরোসিমা—নাগাসাকির কি অবস্থা করেছিল সে ত' সুবিদিত। পৃথিবীর উন্নত দেশগুলির বেশ কয়েকটি নতুন পরমাণবিক-শক্তিকেন্দ্র স্থাপন বন্ধ করে দিয়েছে।

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে পলিথিন ও প্ল্যাষ্টিক অনেক খানি স্থান জুড়ে বসেছে। সস্তা ও হাল্কা বলে এদের জনপ্রিয়তা অসীম। কাচের বিকল্প হিসেবে এর ব্যবহার ও বিস্তৃত। এগুলি কোন জৈবিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করেনা, তাই এগুলি অক্ষয়। কিন্তু এরা তৈলজাতীয় পদার্থে কিছু দ্রবীভূত হয়, এবং তখন স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর হতে পারে। আমেরিকার সমুদ্রোপকূলে এদের যথেচ্ছ নিক্ষেপণ সামুদ্রিক প্রাণীর জীবন এমনই বিঘ্নিত করছে যে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে।

কীটপতঙ্গ - ছত্রাক - নাশক অনেক পদার্থই কৃষি ও অন্যত্র ব্যবহৃত হচ্ছে। এদের কতগুলি সহজে পরিবর্তন হয় না এবং একটি মাত্রা অতিক্রম করলে বিপজ্জনক অবস্থার সৃষ্টি হয়। শুধুমাত্র ডিডিটিই (DDT) এত বেশি ব্যবহৃত হয়েছে যে আমরা প্রত্যেকেই শরীরে অন্তত ২০ মিলিগ্রাম ডিডিটি বহন করছি। শিশুরা মাতৃতুগ্ধ পানের সময় ডিডিটি পান করছে। মৃত্তিকার বহু উপকারী জীবাণু এইসব জীবনাশক পদার্থের উপস্থিতিতে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। বহু কীটনাশক পদার্থ পশ্চিমী তুনিয়ায় আজ নিষিদ্ধ। ভূপালের

দুর্ঘটনা চিরকাল দুঃস্বপ্ন হয়ে থাকবে। এই কারখানায় কীটনাশক দ্রব্য প্রস্তুত হোত।

মানুষের সম্ভাব্য আয়ু ভারতবর্ষে আজ ২৭ থেকে ৫৮ বছরে পৌঁছেছে। এর জন্য অনেকখানি কৃতিত্ব দাবি করতে পারে পেনিসিলিন, স্ট্রেপ্টোমাইসিন জাতীয় অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ। এগুলি প্রথম ব্যবহারের সময় খুবই ফলপ্রসূ হলেও, পরে দেখা যায় বহু জীবাণু সেই ঔষধের ক্রিয়া প্রতিরোধ করতে সক্ষম। এইসব রোগের চিকিৎসা এখন কঠিন হয়ে পড়েছে। যথেচ্ছ ব্যবহার এর একটা কারণ। কৃষিতেও অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহৃত হচ্ছে। এবং এখানেও বিপদের সম্ভাবনা আছে। অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ঔষধ (synthetic drugs) অতিরিক্ত ব্যবহারে অত্যন্ত ক্ষতিকারক। এগুলিও বহুদেশে এখন নিষিদ্ধ।

রাসায়নিক কলকারখানা বহু ক্ষতিকর জৈবপদার্থ, সীসা, পারদ, ক্যাড্‌মিয়াম ঘটিত রাসায়নিক দ্রব্য খালে, বিলে নদীতে নিক্ষেপ করছে। ফলে মাছ, শৈবাল জাতীয় উদ্ভিদ ও জলজ জীব সেই জল পান করছে, রোগাক্রান্ত হচ্ছে। যে সব মানুষ সেইজল ব্যবহার করছে বা ঐ জাতীয় মাছ আহার করছে, তারাও অসুস্থ হচ্ছে। মাছেরা নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে বা অন্যত্র চলে যাচ্ছে।

উপসংহার

জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে মানুষ তার প্রয়োজন ও আরামপ্রিয়তার জন্য নিজেরই মৃত্যুবাণ-বহুদূষক পদার্থ নিক্ষেপ করছে। জীব বিজ্ঞানের একটি প্রধান সূত্র - স্বনিয়ন্ত্রণ, যখনই কোন জিনিষ মাত্রাতিরিক্ত হয়, যে প্রক্রিয়া এই অতিমাত্রার জন্য দায়ী সেই প্রক্রিয়াই ব্যাহত হয় (Negative feedback)। হয়ত এই ভাবেই পরিবেশ ক্রম-

বর্ধমান জনসংখ্যা মানুষের ভুলের সাহায্যে নিয়ন্ত্রিত করতে চায়। সৌভাগ্যবশত এই পরিবেশের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি - মানুষের মস্তিষ্ক। সেই মস্তিষ্কই আজ সজাগ হয়েছে—বিপদের উৎস কোথায়, তার প্রতিকার কি সে সম্বন্ধে সে এখন চিন্তা গবেষণা শুরু করেছে। যে ভাবে এই প্রচেষ্টা চলেছে, বৈজ্ঞানিক গবেষণার গতি এত দ্রুত, মানুষ এখন এ বিষয়ে এতই সচেতন, যে মানুষের শুভবুদ্ধি যদি অবিচলিত থাকে, এই বিপদও কাটিয়ে ওঠা কঠিন হবেনা। পরিবেশ দূষণ মুক্ত হলে, সেই সাম্যাবস্থা আবার ফিরে আসবে, যা জীবনের অস্তিত্বের পক্ষে অপরিহার্য, অবশ্য প্রয়োজনীয়। তবে এর জন্য সকলকেই ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। বিশেষ করে পৃথিবীর ধনী দেশগুলিকে। অধিকাংশ দূষক শিল্প যারা নিয়ন্ত্রণ করছে—তাদের উপরই নির্ভর করছে আমাদের ভবিষ্যতে কি আছে।

□

পরিবেশ ও পরিবহন ব্যবস্থা

মণীন্দ্র নারায়ণ মজুমদার

ভূমিকা

মানব পরিবেশের আলোচনায় পরিবহন ব্যবস্থার গুরুত্ব ক্রমশঃ বাড়ছে। যে "অটোমোবাইল" বা মোটর উন্নত দেশগুলিতে, বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, এক ভয়ঙ্কর সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছে, আশ্চর্য্য ও দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার সেই বহুনিন্দিত অটোমোবাইল-ভিত্তিক পরিবহন ব্যবস্থা শুধু ভারতের মত উন্নয়নশীল দেশ সমূহেই নয়, পূর্ব-ইউরোপ, সোভিয়েত রাশিয়া, এমন কি সম্প্রতি চীন দেশেও বাড়ছে। অটোমোবাইল শিল্পকে সাহায্য করার জন্য বিপুল ব্যয়ে নির্মিত হচ্ছে হাইওয়ে, এক্সপ্রেসওয়ে, ব্রীজ। এরজন্য যাচ্ছে মূল্যবান চাষের ও বসত জমি এবং টাকা। আর অটোমোবাইল নির্গত গ্যাসে (কার্বন মনোক্সাইড, নানান্ জৈবরসায়নিক পদার্থ, সীসা বাষ্প) বিপন্ন হচ্ছে মানুষ ও পরিবেশ। মোটর (এই কথাটি, দিয়ে এরপর আমরা প্রাইভেটকার, বাস, 'টু হুইলার', ট্রাক, প্রভৃতি সবই বোঝাবো) নির্গত কার্বন্‌ডাইঅক্সাইড. গ্যাসে পৃথিবীর 'গ্রীন-হাউস এফেক্ট" বাড়ছে। ১৯৭০ সালের এপ্রিল মাসে আমেরিকায় হঠাৎই যেন ঘুম ভেঙে লোক দেখল মানব পরিবেশ বিপন্ন। শুরু হলো বিরাট পরিবেশ আন্দোলন। উদযাপিত হল "আর্থ উইক"। তারই

এক কার্য্যক্রমে ক্যালিফোর্নিয়ার সান্‌জোস্ ষ্টেট্ কলেজের ছাত্ররা চাঁদা তুলে আড়াই হাজার ডলার দিয়ে নতুন এক মোটর গাড়ী কিনে, মস্ত গর্ত খুড়ে মহাসমারোহে তাকে কবর দিয়ে অটো-মোবাইলের বিরুদ্ধে তাদের প্রতীকী বিদ্রোহ প্রকাশ করল। উন্নত দেশগুলিতে পরিবহন ও পরিবেশ নিয়ে নূতন ও উন্নততর ভাবনা চিন্তা কাজ কর্ম শুরু হয়ে গেছে। আগ্রহের সঙ্গে দেখছি এ বছরের World Watch Institute এর "State of the World 1989" নামক বিখ্যাত বার্ষিক রিপোর্টে Rethinking Transportation শিরোনামায় একটি প্রবন্ধ বেড়িয়েছে। লুঈ মাম্‌ফোর্ড ১৯৫৮ সালের The Highway and the City (Mentor Books, 1964) প্রবন্ধে মোটর ও হাইওয়ের বিধ্বংসিতা সম্বন্ধে পূর্বসতর্কীকরণ করে গেছেন এবং মাম্‌ফোর্ডের বক্তব্যের প্রাসঙ্গিকতা আজ আরো বেড়েছে। কিন্তু আমাদের দেশে পরিবেশ ভাবনায় পরিবহন ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা বিশেষ চোখে পড়ে না। বর্তমান আলোচনায় সেই প্রয়াসই করা হবে। যদিও নানা কারণে তা অগভীরই থাকবে।

মানব সমাজ ও পরিবহন ব্যবস্থা

ইতিহাসে দেখা যায় সভ্যতা ও জ্ঞান বিজ্ঞানের উন্নতির সাথে সাথে পরিবহন ব্যবস্থা উন্নত হয়েছে। মোটামুটি বলা যায় অষ্টাদশ-উনবিংশ শতকে রেলের বাষ্পইঞ্জিন প্রচলিত হবার আগে পর্যন্ত পরিবহনের উপায় ছিল মানুষ ও পশুর পা, পশু-শকট ও জলযান। জলপথ গুলোই ছিল স্বাভাবিক পথ ও হাইওয়ে এবং শহর উৎপাদন কেন্দ্র বাণিজ্য কেন্দ্রাদি বড় বড় নদীর ধারেই গড়ে উঠেছিল। আধুনিক যুগের আগে পর্যন্ত পরিবহনে ব্যবহৃত হত পেশীশক্তি, বায়ু ও জলশক্তি। চাকা, পাল, বাষ্প-

ইঞ্জিন, ইন্টারনাল কম্বাসচন্ ইঞ্জিন, ইলেকট্রিক মোটর, রকেট ইঞ্জিন প্রভৃতি প্রযুক্তিগত উন্নতির মধ্য দিয়ে পরিবহন প্রযুক্তি এগিয়ে গেছে। কার্য্যকরী ভাবে রেল চলতে শুরু করে ১৮২৯ সাল থেকে ইংলণ্ডে, ইলেকট্রিক ট্রেন ১৮৮৮ থেকে আমেরিকায়। ইলেকট্রিক ট্রাম ১৮৯১-এ বার্লিনে। মোটর গাড়ী ১৯০৮ থেকে আমেরিকায়, ও বিমান পরিবহন ১৯১৯ সালে (বিশ্বে)। বাসে মোটর যুক্ত হ'ল ১৯৩০ সালে। দুটি বিশ্বযুদ্ধের সময় সামরিক প্রয়োজনে ইউরোপ আমেরিকার দেশগুলিতে বিপুল অর্থ সম্পদ বিজ্ঞানী ও ইঞ্জিনিয়ারদের নিয়োগ করে মোটর ও বিমান পরিবহনকে বিরাট ভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। লক্ষনীয় আজকের মোটর, বিশেষ করে বিমান উৎপাদক কোম্পানীগুলি, যে বিপুল ক্ষমতা ও মুনাফা অর্জন করছে তার পিছনে সমগ্র সমাজের শ্রম ও সম্পদ ব্যয়িত হয়েছে।

ভারতে পরিবহন

বিমান

ভারতে বিমান পরিবহনের শুরু ১৯২০ সালে। তবে ব্যাপক সম্প্রসারণ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়, যুদ্ধের প্রয়োজনে। স্বাধীন ভারতে বিমান পরিবহন দ্রুত বেড়েছে। জাতীয়করণ হয় ১৯৫৩ সালে। বর্তমানে ৮৪ টি বিমান বন্দর আছে। সামরিক ঘাঁটি সংলগ্ন 'টার্মিনাল' আছে ২৫ টি। বর্তমানে নতুন একটি বিমান বন্দরের জন্য জায়গা লাগে ১২,০০০ একর জমি। কিছু কিছু বিমান (যথা ইঙ্গ-ফরাসী কং কর্ড, রাশিয়ান TU-144) শব্দগতির চেয়ে বেশী বেগে ষ্ট্র্যাটোস্ফীয়ার দিয়ে চলে। তাদের নির্গত ধোঁয়ায়

জীবজগৎ রক্ষাকারী ওজনস্তর বিনষ্ট হচ্ছে। নির্গত ধোঁয়ায় যে জলীয়বাষ্প ও নাইট্রিক অক্সাইড্ থাকে তাই ওজনের সঙ্গে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় ওজনকে নষ্ট ক'রে অক্সিজেনে পুনঃ পরিবর্ত্তন করে। নাইট্রিক অক্সাইড বিশেষ ভাবে ক্ষতিকর, কারণ এটি ওজনের অক্সিজেনে রূপান্তরে অনুঘটকের কাজ করে। উন্নত দেশগুলিতে বিজ্ঞানী ও রাজনীতিকরা ওজনস্তর রক্ষা নিয়ে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত, কারণ ষ্ট্যাটোস্ফীয়ারে ওজন (বাতাসে ঘনত্ব 10 ppm) সূর্য্যালোক থেকে শক্তিশালী অতিবেগুনী রশ্মির ক্ষতিকারক অংশগুলি (৩৪০ ন্যানোমিটার তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের নীচের) আটকে দিয়ে নিচে উদ্ভিদ্ ও প্রাণিজগতকে রক্ষা করে। বিমান পরিবহনে বিপুল পেট্রল নষ্ট হয়, আর বিমান বন্দরের চারিপাশে মানুষ ও জীবজগৎ শব্দ দূষণে পীড়িত হয়।

মোটর

পরিবহন ব্যবস্থায় মোটর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে আরম্ভ করে ১৯০৮ সাল থেকে, যখন হেনরী ফোর্ড আমেরিকায় তাঁর কারখানায় প্রথম ব্যাপক মোটর (Model T) তৈরীর ব্যবস্থা করতে পারলেন। ১৯০০ সালে ৮০০০ গাড়ীর রেজেষ্ট্রীকরণ ছিল। ১৯৩০ সালে এই সংখ্যা হয়ে দাঁড়াল ২ কোটি ৩০ লক্ষ। যে সব উন্নয়নের ফলে মোটর আধুনিক রূপ পেল তা ঘটেছে মোটামুটি দুটি বিশ্বযুদ্ধ মধ্যবর্ত্তী সময়ে। ১৯৮৭ সালে পৃথিবীতে মোট ৪০ কোটি মোটর যান পৃথিবীর রাস্তাগুলি জ্যাম করেছে। বাই সাইকেলের সংখ্যা ছিল ৮০ কোটি। ঐ বছর প্রতিদিন রেকর্ড সংখ্যক (১, ২৬,০০০ টি) মোটর গাড়ী ফ্যাক্টরীগুলি থেকে তৈরী হয়ে বেরিয়েছে। সড়ক, ব্রীজ টানেল ইত্যাদি তৈরীর প্রযুক্তির উন্নতি মোটর গাড়ীর উন্নতির সাথে সাথে হয়ে গেছে। ভারতে মোটর পরিবহনের অবস্থাটা নিম্নোক্ত সারণি থেকে কিছুটা বোঝা যাবে।

সারণি—১ ভারতে সড়ক ও মোটর পরিবহন সম্প্রসারণের ধারা

	অটোমোবাইল					সড়ক (হাজার কিমি)	
বছর	মোট সংখ্যা	কার	ট্যাক্সি	বাস	মালবাহী	পাকা	মোট
১৯৫০-৫১	৩০৬,৩১৩	১৪৭,৭১২	১১,৫৫১	৩৪,৪১১	৮১,৮৮৮	১৫৭	৪০০
১৯৬০-৬১	৬৬৪,৪৭৫	২৫৬,২৪৩	২১,৬৬৩	৫৬,৭৯২	১৬৭,৬৪৯	২৬৩	৫২৪
১৯৭০-৭১	১,৮৬৫,৩১৫	৫৩৯,৪৭৫	৬০,৪৪৬	৯৩,৯০৭	৩৪২,৫৭৭	৪২৩	১০২২
১৯৮০-৮১	৫,১৭৩,০১৩	৮৯৮,১৪৩	১০০,০০৯	১৫৩,৭৫৭	৫৬৪,৮৪৩	—	—
১৯৮২-৮৩	৬,৭১৮;৫৩৯	১,০৬০,৭৪২	১৩৬,০০৩	১৭৭,৭৬৮	৬৯৫,৭৫৯	—	—

রেলপথ

ভারতে রেলযুগের সূচনা ১৮৫৩ থেকে (বম্বে-থানা, হাওড়া-হুগলী) নিম্নোক্ত সারণি থেকে ভারতে রেল সম্প্রসারণের ধারা সম্পর্কে কিছু ধারণা করা যাবে।

কাল	রেল পথের দৈর্ঘ্য (মাইলে)	রেলে লাভ-লোকসান (লক্ষ টাকা)
১৮৭৩	৫,৬৭৯	—
১৮৯০	১৬,৯৮৪	—
১৯০০	২৬,৪৭৪	—
১৯৫০-৫১	৫৩,৫৯৬	(+) ৪১,৫০৬
১৯৬০-৬১	৫৬,২৪৭	(+) ৩,২০১
১৯৭০-৭১	৫৯,৭৯০	(—) ১,৯৮৪
১৯৮০-৮১	৬১,২৪০	(—) ১৯,৭৮৪
১৯৮৪-৮৫	৬১,৮৫০	(—) ১৯,৫৫৯
১৯৮৭-৮৮	৬১,৯৭০	—

লক্ষনীয় যে স্বাধীন ভারতে রেল সম্প্রসারণ যত না হয়েছে, তার থেকে অনেক বেশী হয়েছে সড়ক ও মোটর পরিবহন। ৭০ এর দশকের আগেই রেল লোকসানের সংস্থায় পরিণত হয়েছে। পাশ্চাত্য দেশে যখন অটোমোবাইলের ব্যাপক সম্প্রসারণ হয়, তখন কম্যুনিষ্ট দেশগুলি বাদে অন্যত্র ঘটে যায় রেলের সংকোচন যথা ঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র—১,০৬,০০০ (১৯৫৮) থেকে ৫১ ০০০ মাইল (১৯৭০); পশ্চিম ইউরোপ—১২২,০০০ (১৯৫৩) থেকে ১১০,০০০ মাইল (১৯৬৮) (রাশিয়া ও পূর্ব ইউরোপ বাদে)।

জল পরিবহন

দেশের পক্ষে সবচেয়ে উপযোগী যে জলপরিবহন তা থেকে গেছে একেবারেই অবহেলিত। অন্তর্দেশীয় জলপরিবহন রাজ্যের অধিকারে। এ বিষয়ে ভাবনাচিন্তা কাজকর্ম অর্থ বিনিয়োগ খুবই কম। আগের কালে শিল্প সভ্যতার প্রসার এতদঞ্চলে জলপথ ধরেই হত। গত শতকেও রাণীগঞ্জ থেকে কয়লা জলপথে দামোদর দিয়ে কলকাতায় আসতো। যে সরস্বতী দিয়ে বণিক সওদাগরদের বাণিজ্য তরী যাতায়াত করতো তা অন্যান্য বহু নদীর মত আজ মৃত। নদী ও খাল সংস্কারে বর্ত্তমানে সরকারী উদ্যোগ কিছুমাত্র দেখা যায় না। নিম্নোক্ত সারণি থেকে ভারতে অন্তর্দেশীয় জল পরিবহন সম্বন্ধে কিছু ধারণা পাওয়া যেতে পারে।

জলপথ (কিমি)	মোট দৈর্ঘ্য (কিমি)	ব্যবহৃত হয় —	মন্তব্য
বড় নদী	৫ ২০০	১৭০০	অন্তর্দেশীয় জল পরিবহনে
খাল	৪,৩০০ (যান্ত্রিক জলযান যোগ্য ৪৮৫)	৩৩১	প্রায় দুই পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ব্যয় বরাদ্দ ছিল এককোটি টাকারও কম।

প্রকৃতির কতগুলি অপ্রতিরোধ্য গতি আছে তাতে বিঘ্ন ঘটানোর চেষ্টা হ'লে সমস্ত পরিবেশটাই বিঘ্নিত, এমনকি বিনষ্ট হ'য়ে যেতে পারে। তাই প্রকৃতিকে জয় করা বা তার উপর প্রভুত্ব করা নয়, তার নিয়ম-কানুনবুঝে সেগুলিকে মানুষের কাজে লাগানো, তার সাথে সহাবস্থান করাই যে নির্ভুল ও গভীরতম বৈজ্ঞানিক মানসিকতা. এই সত্যই আজ ১৯৮০-র দশকে দিবা-লোকের মত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। রাইট লাইভলিহুড, ফাউণ্ডেশনের বিকল্প নোবেল থেকে ইউরোপের সবুজ-শান্তি (গ্রীনপীস্) আন্দোলন, রাশিয়ার পরিবেশ সচেতন গোষ্ঠী থেকে দিল্লীর সেণ্টার ফর সায়েন্স এ্যাণ্ড এনভিরনমেণ্ট—অনেকের ভিতরই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে এই সত্যের প্রকাশ দেখা যাচ্ছে। এই সত্য অবহেলা করলে কি ধরণের ক্ষতি হতে পারে তা বৃটিশ ভারতে রেলপথ তৈরীর ফলাফল থেকে কিছু বোঝা যাবে। এই প্রসঙ্গে আমি প্রত্যেককে সখারাম গণেশ দেওস্করের "দেশের কথা" র (১৩১১, শতবার্ষিকী মুদ্রণ, ১৩৭৭, সাহিত্যলোক) ('রেল ও খাল' অধ্যায়) ও মেঘনাদ সাহার নদী ও বন্যা বিষয়ক রচনাবলী (Collected Works of Meghnad Saha, SINP & Orient Longman, 1986) পড়তে অনুরোধ করবো। বৃটিশ তার স্বার্থে ভারতের উপর রেলপথ চাপিয়ে দিয়েছিল কাঁচামাল ও পণ্যদ্রব্য আনানেওয়ার জন্য এবং শাসন প্রশাসনের সুবিধার জন্য। রেলপথ যাতে বন্যায় ভেঙে না যায় তারজন্য তাকে বহুস্থানেই দু-পাশের জমি থেকে উঁচু করে বসাতে হয় যার ফলে রেল লাইনগুলিই বৃষ্টি ও বন্যার জলকে সহজে নেমে যেতে দেয় না। তারজন্য জনপদ, শস্যক্ষেত্রাদি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। রেললাইনের মাঝে মাঝে জল নিকাশী কিছু কিছু ফাঁক 'কালভার্ট', ব্যাপক জলকে নামিয়ে নেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট নয়।

তাছাড়া রেল লাইনের জন্য নদীতে পোস্তা (pier) ওয়ালা ব্রীজ বসানোর ফলে জল ও জল বাহিত পলির চলন বিঘ্নিত হয় এবং নদী মজে যায়। (শ্রীকপিল ভট্টাচার্য্যের 'বাংলার নদ-নদী পরিকল্পনা' গ্রন্থটি এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য)। বাংলাদেশ (পূর্ব ও পশ্চিম) প্রকৃত পক্ষে গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের দান। যুগ যুগ ধরে ভূ-ভাগ ও পাহাড় ক্ষয় ক'রে পলি ও কাকড় ইত্যাদি ব'য়ে এনে সমুদ্র ভরাট ক'রে এই অঞ্চল সৃষ্ট হয়েছে। এই অঞ্চল, বিশেষ করে নিম্নবঙ্গ এখনও ভূ-তাত্ত্বিক দিক থেকে যথেষ্ট সুগঠিত নয়। এই অঞ্চলে নদনদী সমূহ প্রায়ই গতিপথ পরিবর্তন করে। মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে বর্ষাকালে বঙ্গভূমিতে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। সেই জলকে ভূ-ভাগের ঢাল (উত্তর, উত্তর-পশ্চিম থেকে দক্ষিণ, দক্ষিণ-পূর্ব) ধরে সমুদ্রের দিকে যেতেই হবে। না যেতে পারলে বা যেতে দেরী হলেই বন্যাজনিত ক্ষয়ক্ষতি, কখনো ব্যাপক সর্বনাশ। স্বাভাবিক ভাবেই এই অঞ্চলের পরিবহন, উন্নয়ন ভাবনাদি অন্যদেশের সাথে মিলবে না। শত সহস্র বছর ধরে পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতা—লব্ধ জ্ঞান নিয়ে মানুষ এই অঞ্চলে জনপদ নগর শস্যক্ষেত্রাদি যা গড়ে তুলেছিল তাকে হঠাৎই বিপর্যস্ত করে তুললো বৃটিশের বানানো রেলপথ।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে হাওড়া-বর্দ্ধমান রেলপথ তৈরী হয় (১৮৫৬) এবং তার সুরক্ষার জন্য দামোদরে বাঁধ দেওয়া হয়। এর পর থেকেই বর্দ্ধমানের দুঃখের কালের শুরু। ১৮১৫ সাল পর্য্যন্ত বর্দ্ধমান ছিল সারা ভারতের—সম্ভবতঃ সারা পৃথিবীর-সমৃদ্ধতম জেলা। এখানে ধান আখ, তৈলবীজ, তুলো প্রচুর উৎপন্ন হ'ত। এখানকার রেশম ও সুতীবস্ত্রের বিশ্বের বাজারে কদর ছিল। অঞ্চলটি স্বাস্থ্যকর স্থান হিসাবেও পরিগণিত ছিল। ১৮৫০ সাল পর্যন্ত কলকাতা থেকে লোকে স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য বর্দ্ধমানে এসে বাস করতো, যেমন এখন লোকে দেওঘর বা শিমুলতলায় যায়। রেললাইন

ও বাঁধ বসানোর ফলে অনেক নদী মজে গেল, যেখানে সেখানে অস্বাস্থ্যকর জলভূমি সৃষ্টি হল আর কৃষির অবনতি ঘটলো। ১৮৬০-৭০ এই দশ বছরে বর্দ্ধমান বিভাগের অর্দ্ধেক লোক ম্যালেরিয়ায় মারা গেল। বিশিষ্ট হাইড্রলিক এঞ্জিনিয়ার স্যার উইলিয়াম উইল্‌কক্স (নীল নদীর আসোয়ান বাঁধ খ্যাত) ১৯২০-এর দশকে বাংলাদেশের নদনদী পর্যবেক্ষণ করে এই সিদ্ধান্তে আসেন যে পরিবেশ ও দেশের অবনতির মূল কারণ হল রেলপথ। তিনি বলেন—প্রথমতঃ রেলপথ নিজেই একটা শক্ত বড় বাঁধ; দ্বিতীয়তঃ রেললাইনকে যাতে বন্যার জল ভেঙে ফেলতে না পারে তাই তার একধারে সমান্তরাল ভাবে শক্ত করে দেওয়া হল নদী বাঁধ। এই বাঁধকে কোন স্থানে ভাঙাকে দণ্ডনীয় অপরাধ বলে আইন করা হল। এছাড়া জেলাবোর্ডের আরও কয়েকটি সমান্তরাল রাস্তাও বানানো হল রেল লাইনকে সুরক্ষিত করার জন্য। এসবের দ্বারা উত্তর ভারতের সাথে সরাসরি যোগাযোগের জন্য হয়তো নিরাপদ একটি হাইওয়ে উন্মুক্ত হয়েছিল, কলকাতার ব্যবসা-বাণিজ্য ভালো বেড়েছিল এবং জীবিকার সন্ধানে উত্তর থেকে নানাদেশী লোকজন কলকাতায় ভীড় করেছিল। কিন্তু তারজন্য বর্দ্ধমানকে বিষম মূল্য দিতে হয়েছিল। রেললাইন ও বাঁধের ফলে আগে বন্যার জল যে সব অঞ্চল দিয়ে বইত তা ব্যাহত হল কৃষিক্ষেত্র জল ও নদীর বয়ে আনা উর্বর পলি থেকে বঞ্চিত হল এবং দামোদরের শাখা ও উপনদীগুলিকে রুদ্ধ করে মেরে ফেলা হ'ল। নদীর জলকে একটি নির্দিষ্ট চ্যানেল দিয়ে চলতে বাধ্য করায় পলি, কাঁকড় জমে দ্রুত নদীর তলদেশ ভরাট হয়ে হয়ে নদী দুপাশের জমির উপর দিয়ে বইতে থাকে। ফলে নদী বাঁধ ভেঙে প্রায়ই প্রলয়ঙ্কর ক্ষতি করে। স্যার উইল্‌কক্স বলেছেন গভর্নমেণ্ট বর্দ্ধমান জেলায় পাঁচটা শয়তানের বেড়াজাল বানিয়েছেন। মেঘনাদ সাহা এই প্রসঙ্গে মন্তব্য

করেছেন ঃ নিষ্ঠা ও ধৈর্য ধরে পর্যবেক্ষণ ও অনুশীলন এবং প্রাজ্ঞ পরিকল্পনায় কারো উৎসাহ দেখা যায় না। সংস্কার ও উন্নয়নকে চাপিয়ে দেওয়া হয়।

মধ্যবঙ্গেও (নদীয়া-মুর্শিদাবাদ) অনুরূপ ইতিহাস। এই অঞ্চলের সমৃদ্ধির বৃত্তান্ত (দ্রষ্টব্য ঃ "সোনার বাংলা" অধ্যায়, বাদশাহী আমল, বিনয় ঘোষ কৃত ফ্রাঁসোয়া বার্নিয়েরের ভ্রমণ বৃত্তান্তের বঙ্গানুবাদ) আজকের ছেলেমেয়েদের কাছে রূপকথার বর্ণনা মনে হবে। ইবন বতুতার ভ্রমণবৃত্তান্ত ও এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। উইলিয়াম উইল্‌কক্সের মতে সেই সমৃদ্ধির পুনরুদ্ধার সম্ভব যদি সঠিক ভাবে এই অঞ্চলের নদী পরিকল্পনা করা যায়।

উত্তরবঙ্গের পাবনা-রাজশাহী বগুড়ার বন্যার তাণ্ডবে শস্যহানি, জীবনহানি ও ম্যালেরিয়ার প্রকোপ বাড়তে থাকে সারা-সিরাজগঞ্জ, সারা-সান্তাহার-জলপাইগুড়ি এবং সান্তাহার-বগুড়া প্রভৃতি রেল লাইন হবার পর থেকে। এ বিষয়ে মেঘনাদ সাহার রচনা থেকে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করার লোভ সংবরণ করতে পারছি না কারণ জন্ম থেকেই ঐ পরিবেশ ও প্রকৃতির সাথে বর্তমান লেখক সুপরিচিত ঃ—

"প্রথমেই মনে রাখা উচিত এই বার্ষিক প্লাবনগুলি কখনোই কোনরূপ অভিশাপ ছিল না, বরং প্রকৃতির বিরাট এক আশীর্বাদ রূপেই গণ্য হত। কারণ, উর্বর পলি শস্যক্ষেত্রে ছড়িয়ে যেত, যার ফলে কৃত্রিম জলসেচ অপ্রয়োজনীয় ছিল। এই অঞ্চলে লোকে এমন ভাবেই তাদের জীবনযাত্রা মানিয়ে নিয়েছিল যাতে বার্ষিক প্লাবনে কেউ কোনভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। বাড়ীগুলো উঁচু জমিতে বা জমি উঁচু করে বানানো হত। বিল অঞ্চলে এক-ধরণের লম্বা আমনধান বর্ষার আগে বোনা হত যা জলবৃদ্ধির সাথে তাল মিলিয়ে বাড়তে পারতো। জল হঠাৎ না বেড়ে ধীরে ধীরে

বাড়লে ধান ১০ থেকে ১২ ফুট পর্যন্ত বাড়তো।" (রাজশাহী ডিষ্ট্রিক্ট গেজেটীয়ার)। (এই প্লাবনের আর এক ফসল ছিল বিরাট এক মৎস্য সম্ভার, প্লাবনান্তে পাখী আর ফসল)। আজকের বিজ্ঞানের বিদেশী বই, জার্নাল, বিদেশী পরামর্শদাতা বিশেষজ্ঞ, বিদেশী কারিগরী সহযোগিতার উপর ক্রমর্দ্ধমান নির্ভরতার যুগে রেলপথ ও বন্যা প্রসঙ্গে মেঘনাদ সাহার অপর একটি বক্তব্যাংশও প্রাসঙ্গিক মনে করি ঃ

"আমি একবারের জন্যও বলতে চাইছি না যে রেলওয়ে এঞ্জিনিয়ার-রা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে এইসব দুষ্টামি করছেন। কিন্তু এটা পরিষ্কার যে তাঁরা সমাজের কোন মঙ্গল করতে পারেন নি। ইংলণ্ডে শিক্ষাপ্রাপ্ত এঞ্জিনিয়ারদের পক্ষে এটা বোঝা সম্ভবই না এদেশের চাষীর সত্যিকার প্রয়োজন কি এবং চাষ ব্যবস্থায় অবাধ প্লাবনের কি দারুণ গুরুত্ব। চাষী এখানে চাষের ক্ষেত নিয়েই বাঁচে এবং মরে।"

পূর্ব ও পশ্চিমবাংলা এবং তৎসংলগ্ন কিছু অঞ্চল আজ পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বন্যাপ্রবণ অঞ্চল। পূর্ববাংলার বন্যায় এবছরে যা ক্ষতি হয়েছে আগে কখনও তা হয়নি। সেখানে নদীগুলির অনেকই মজে গেছে কিন্তু রাস্তা ও মোটর অনেক বেড়েছে। সমুদ্র থেকে নোনাজল দেশের অভ্যন্তরে বহুদূর পর্যন্ত আসছে। বাংলাদেশ এখন পৃথিবীর মধ্যে দরিদ্রতম দেশের অন্যতম। ধান সহ নানান উদ্ভিদের, মাছসহ নানান প্রাণীর প্রজাতি বৈচিত্রও (জেনেটিক ডাইভার্সিটি) ভয়ঙ্কর কমছে।

পরিবেশ ও সুস্থ পরিবহন ব্যবস্থা

আমাদের দেশের পরিবহন ব্যবস্থা দেশের মানুষের প্রয়োজন; তার উৎপাদন ব্যবস্থা, ভূগোল ইতিহাসের সাথে সঙ্গতি রেখে

গড়ে উঠবে, এটাই দরকার ছিল। সেই পরিবহন ব্যবস্থাই সন্তোষজনক যা উপযুক্ত গতিবেগে প্রয়োজনীয় পরিবহন করতে পাবে, পরিবেশের মারাত্মক ক্ষতি করে না, ফসিল ফুয়েলের (জীবাশ্ম-জালানির) যথাসম্ভব সংরক্ষণ ক'রে নবীকরণযোগ্য শক্তির অধিকতর ব্যবহার ক'রে, কৃষি ও অন্যান্য উৎপাদন ব্যবস্থার সহায়ক এবং যথাসম্ভব স্বদেশী জিনিসপত্র ও যন্ত্রপাতি ব্যবহার ক'রে ও লোকের কর্মসংস্থান বাড়ায়। "সবচেয়ে ভালো পরিবহন ব্যবস্থা বা উপযুক্ত গতিবেগ বলে কিছু থাকতে পারেনা। মানুষের প্রয়োজন ও সুযোগ-সুবিধাই নির্দ্ধারণ করবে কোন পরিবহন উপায় কতখানি গুরুত্ব পাবে" (লুঈ মামফোর্ড)। বৃটিশরা ভারতে রেলপথের স্থাপনা ও সম্প্রসারণ করেছিল এদেশকে শাসন ও শোষণ করবার জন্য। এখানকার জলনিকাশী ব্যবস্থা, কৃষি ও মৎস্যজীবীর প্রয়োজন, এখানকার সমাজ ও মানুষের প্রয়োজন ভালো করে দেখা হয়নি। ফলে দেশের কি অবনতি ঘটেছিল. তা ইতিহাসে আছে। রেলপথ ও হাইওয়ের মর্মে বিশেষ পার্থক্য নাই। বরং নানাদিক দিয়ে হাইওয়ের পরিবেশ বিধ্বংসিতা অনেক বেশী। আমেরিকায় ১৯৫০ এর দশকে হাইওয়ে বানাতে যে ভাবে মাটি জল বনভূমি সহ সমগ্র মানব পরিবেশের ক্ষতি করা হয়েছে, তাকে মাম্‌ফোর্ড টর্নেডো বা এ্যাটমবোমার ধ্বংসের সাথে তুলনীয় মনে করেছেন।

জমি নষ্ট

মোটর গাড়ী পার্ক করার জন্য, গ্যারেজের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অন্ততঃ একশ ষাট হাজার (১৬০,০০০) বর্গ কিলো মিটার জমি পাকাকরা হয়েছে (১৯৮৮ সালের হিসাব), যা দেশের সমগ্র জমির প্রায় দুই শতাংশ, আর চাষযোগ্য জমির দশ শতাংশ। পৃথিবীর বড় বড় শহরের এক-তৃতীয়াংশ জমি মোটর গাড়ীর সেবায় ব্যয়িত। আমে-

> কংক্রীটের রাস্তা, পার্কিংলট এইসব দিয়ে আধুনিক বড় শহর-গুলি তাদের অবশ্যাম্ভাবী পিরামিডের কবর বানাচ্ছে।
>
> —লুঈ মামফোর্ড

রিকার শহরগুলিতে এটা প্রায় অর্দ্ধেক, আর লস্ এঞ্জেলসে এটা প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ। বড় বড় শহরে চলাফেরা আজকাল দুঃসাধ্য হয়ে পড়েছে। কলকাতার মত শহরে একজন আরোহীর পাবলিক বাসে গেলে যে পরিমাণ রাস্তা-জমির দরকার হয়, প্রাইভেট কারে গেলে তার নয়গুণ রাস্তাজমি লাগে। মোটর গাড়ী নিয়ন্ত্রণের অধিকার ভারতে রাজ্য সরকারের। কলকাতায় মোটর ও যানজট বাড়ছেই। দেশের বৃহত্তর উৎপাদন ও গ্রামাঞ্চলকে বঞ্চিত ক'রে কলকাতার মত শহরগুলিতে বাড়ছে ফ্লাইওভার, সাবওয়ে ইত্যাদি এবং অধিবাসী পদচারীদের থেকে ধীরে ধীরে রাস্তা জমি মাঠ ময়দান পার্ক যাচ্ছে অটোমোবাইলের গহবরে।

আর্বান থ্রম্বোসিস্

এতদসত্বেও শহরের পরিবহন সমস্যা বাড়ছে বই কমছেনা। এ একটা দুষ্টচক্র ঃ মোটর বাড়লে রাস্তা বাড়াতে হয়, রাস্তা বাড়লে আরো মোটর আসে। আভ্যন্তরীন পরিবহনে মেট্রোরেল বেশ কার্য্যকরি, যদিও তা ভয়ঙ্কর ব্যয়বহুল। তৃতীয় বিশ্বে কলকাতা আর কায়রো ছাড়া আর কোথায়ও মেট্রোরেল নাই।

মোটর গাড়ীর যুগের আগে এই শতকের গোড়ায় নিউইয়র্কে ঘোড়া গাড়ীর গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় ১৭ কিমি, যা বর্তমানে দাঁড়িয়েছে ১১ কিমিতে। লণ্ডন শহরে গাড়ীর গড় গতিবেগ বর্তমানে ১৩ কিমি, টোকিওতে আরও কম। স্পষ্টতঃই উন্নয়ন ও পরিবহন ভাবনা ও কাজকর্ম ঠিক পথে যাচ্ছে না। পদচারীর গতিবেগ ঘণ্টায় ৫ কিমি

> আমাদের (এই বিংশ) শতাব্দীর সবচেয়ে মারাত্মক রোগ কোনটি ? ক্যান্সার ? অ্যাথেরোস্‌ক্লিরোসিস্‌ ? না। হাইপো-ডিনামিয়া—স্বল্প তৎপরতা বা কম নড়াচড়া। আমাদের জন্য সবকিছুই করে মেসিন। আমরা কম চলাফেরা করি। কাজে যাই বাসে বা গাড়ীতে করে। রাত্রে টিভিতে হকি বা ফুটবল দেখেই খেলাধূলার কাজ সাঙ্গ করে নিই।
>
> —সোভিয়েত বিশেষজ্ঞবৃন্দ। ১৯৮৬

(আদিম কাল থেকে এ পর্যন্ত এই বেগের বিশেষ পরিবর্তন হয়নি), অশ্ব ও অশ্ব শকটের প্রায় ১০ কিমি, বাস ও ট্রলি ৮-৯ থেকে ১৯-২২ কিমি (শহরের বাইরে ফাঁকা রাস্তায় এই গতিবেগ বাড়তে পারে)। পদচারী ও সাইকেল আরোহীরা সর্বত্রই খর্বিত, অবদমিত। অথচ মানুষের পা পরিবহনের একটা গুরুত্বপূর্ণ উপায় হতে পারে, ছিলও আগে। পায়ের ব্যবহার কমানোর ফলে নানান ধরণের রোগও বেড়েছে, বাড়ছে।

খর্বিত পদচারী

লণ্ডনে জনপরিবহন ব্যবস্থা চালু হবার আগে লণ্ডনব্রীজ দিয়ে প্রতিঘণ্টায় পঞ্চাশ হাজার লোক কাজে যেত। অথচ আমেরিকার সবচেয়ে ভালো এক্সপ্রেসওয়ে অনেক বেশী জায়গা নিয়েও ঘণ্টায় চার থেকে ছয় হাজারের বেশী গাড়ী পরিবহন করতে পারে না। প্রতিটি গাড়ীর গড় আরোহী দেড়জন ধরে নিলে এটা মানতে হবে যে এই ধরণের অটোমোবাইল পরিবহন সবচেয়ে কম কার্য্যকরী ও ব্যয়বহুল, বিশেষ করে যখন যাত্রী পরিবহনের চাপ সর্বাধিক। পদযাত্রীদের সম্মান ও যত্ন নেওয়া উচিত। তাদের যাতায়াতের

শক্তি রূপান্তরের কর্মক্ষমতা
(Efficiency of Energy Conversion)

ধরণ	কর্মক্ষমতা (%)	শক্তির রূপান্তর
১) পদচারী মানুষ (কোন যান্ত্রিক সাহায্য ছাড়া)	১২	রাসায়নিক থেকে যান্ত্রিক
২) সাইকেলে মানুষ	৫০	ঐ
৩) বাষ্পীয় ইঞ্জিন	৮	রাসায়নিক থেকে তাপীয় থেকে যান্ত্রিক
৪) ইণ্টারনাল কম বাসচন ইঞ্জিন (অটোমোবাইল)	২৫	ঐ
৫) ইলেকট্রিক মোটর (বড়)	৯২	বৈদ্যুতিক থেকে যান্ত্রিক

সুযোগ সুবিধা বাড়া উচিত। পথের ধারে সুন্দর গাছপালা বসবার জায়গা ও চা-জলখাবারের দোকানের ব্যবস্থা থাকা উচিত। ভারতের ব্যাঙ্গালোর শহরে পদ-পরিবহন গুরুত্বপূর্ণ। আফ্রিকার কিছু শহরেও পায়েই বেশী লোক যাতায়াত করে, যেমন কিনসাশায়। তৃতীয় বিশ্বের বহুস্থানেই গরিব মানুষদের পায়ে হেঁটেই যাতায়াত করতে হয়, এমনকি মালপত্রও নিজেদেরই বইতে হয়। পরিবহন ক্রমশঃ ব্যয়বহুল হয়ে পড়ছে। সমীক্ষায় দেখা গেছে বর্তমানে নয়াদিল্লীতে সমাজের দুর্বলতম শ্রেণীর লোকেদের তাদের পারিবারিক আয়ের ২০ থেকে ২৫ শতাংশ পরিবহনে ব্যয় করতে হয় আর বিত্তশালী লোকেরা অনেক কম করে।

সাইকেল পরিবহন ব্যবস্থায় আরো গুরুত্ব পেতে পারে। সাইকেলের যান্ত্রিক উন্নতির সাথে সাথে (লক্ষনীয় এব্যাপারে সরকার ও বিজ্ঞানীরা আগ্রহী নন) সাইকেলের রাস্তা ভালো ও তার জন্য আলাদা লেন্ থাকা উচিত। মনুষ্যপেশীশক্তি চালিত বাইসাইকেল পেট্রলের সাশ্রয় করে, পরিবেশের ক্ষতি করে না এবং তার উৎপাদন ও মেরামতিতে প্রচুর কর্মসংস্থান হতে পারে।

পাশ্চাত্য দেশের আগামী পরিবহন ব্যবস্থায় বাইসাইকেল গুরুত্বপূর্ণ স্থান নেবে। এটাই বর্তমানে তথ্যাভিজ্ঞমহলের ধারণা। পৃথিবীতে বর্তমানে বছরে ১০ কোটি সাইকেল তৈরী হয়, যার বেশীর ভাগই এশিয়াতে। চীন দেশের পরিবহনেও বাইসাইকেল খুব গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে জাপান, পশ্চিম জার্মানী, ডেনমার্ক, নেদারল্যাণ্ডে বাইসাইকেল ক্রমশঃ গুরুত্বপূর্ণ ও অধিকতর জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। সরকারি সুযোগ-সুবিধাও দেওয়া হচ্ছে, যেমন—রাস্তায় আলাদা বাইসাইকেল লেন, বাসে ট্রেনে নিয়মিত সাইকেল পরিবহনের ভালো পাকা বন্দোবস্ত। নেদারল্যাণ্ডে ৯ হাজার মাইল বাইসাইকেল পথ আছে। জাপানের কাসুকাবে শহরে বারোতলা বাড়ীর মত করা হয়েছে যেখানে দেড় হাজার সাইকেল রাখা যায় এবং ক্রেনের সাহায্যে নামানো ওঠানো হয়। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে (মোটর শিল্পের হেডকোয়ার্টার) সরকারি কাজকর্মে বাইসাইকেলকে খেলনাদপ্তরে রাখা হয়েছে, পরিবহনে নয়। আর বিশ্বব্যাঙ্কের তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির পরিবহন সমীক্ষার সাম্প্রতিক রিপোর্টে (১৯৮৫) চীন দেশের পরিবহন বিবরণে বাইসাইকেল কথাটির উল্লেখমাত্র নাই। বিপ্লবোত্তর মাও সেতুঙ—চৌ-এন লাই এর আমলে চীনা প্রধান মন্ত্রী চৌ-এন্ লাইকে ব্যক্তিগত ও ছোটখাট কাজকর্ম বাইসাইকেলেই সারতে হতো। সরকারি কাজকর্মেই

পৃথিবীতে মোটরবহর (Fleet) ও মোটর ঘনত্ব (অঞ্চল অনুসারে)

দেশ	১৯৭০ (মোটর ঘনত্ব ঃ গাড়ী পিছুলোক)	১৯৮০	১৯৮৬ (সংখ্যা লক্ষে)
মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র	২.০	১.৮	১৩৫০
পশ্চিম ইউরোপ	৫.২	২.৮	১২৫০
জাপান	১২.০	৪.২	২৯০
পূর্ব ইউরোপ	৩৬.০	১১.	১৭০
সোভিয়েত ইউনিয়ন	১৪৭	২৪	১২০
ভারত	৯০২	৩৫৪	১৪
চীন	২৭,০৭০৭	১,৩৭৪	৮
পৃথিবী	১৮	১২	৩৮৬০

প্রধান মন্ত্রী মোটরগাড়ী ব্যবহারের সুযোগ পেতেন মাত্র। চীনে আবাদী জমির পরিমাণ ভারতের থেকেও কম। চীন তাই প্রতি-দিন দশলক্ষ ব্যারেল পেট্রোলিয়াম রপ্তানী করলেও সেদেশে প্রাইভেট-কার ছিলই না প্রায়।

সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য ধনতন্ত্রের সহজাত আধুনিক বিজ্ঞান বর্তমানের প্রবল শক্তিরধবরূপে প্রযুক্তি ও সাংস্কৃতিক বিজয়ের মাধ্যমে তার রাজনৈতিক বিজয়ও যে সমাধা করতে চলেছে তার লক্ষণ আজ পৃথিবীর সর্বত্রই দেখা যাচ্ছে। এ প্রসঙ্গে ওয়াল্ড ওয়াচ ইনষ্টিটিউটের (এটি কোন সমাজতান্ত্রিক বা বামপন্থী সংস্থা নয়) ১৯৮৯. সালের বার্ষিক রিপোর্ট থেকে কিছু খবর ও মন্তব্য

উল্লেখ্য মনে করি। রিপোর্টে'র এক জায়গায় বলা হয়েছে ঃ "১৯৭০ এর দশক পর্যন্ত রাশিয়া ও পূর্ব ইউরোপে ট্রেন্, ট্রাক্ ও বাস উৎপাদনের উপর সমধিক জোর ছিল। এরপর ক্রেতার চাপে ১৯৭০ থেকে ১৯৮৫ সালের মধ্যে সোভিয়েত্ ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপে 'কার' উৎপাদন পাঁচগুণ বেড়ে হয়েছে ২৭ লক্ষ। গোর্বাচভের পেরেস্ত্রোয়িকার পর সোভিয়েত ইউনিয়ন তার ১৪ লক্ষ বার্ষিক কার' উৎপাদনকে দ্বিগুণ করার পরিকল্পনা নিচ্ছে।" চীনদেশও অধিক মোটর কার উৎপাদনের দিকে যাচ্ছে।

উন্নয়নশীল দেশ সমুহেও মোটর গাড়ীর মালিক হবার লোভ বাড়ছে। আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল ও মেক্সিকোতে আছে উন্নয়নশীল তৃতীয় বিশ্বের অর্দ্ধেক মোটর গাড়ী। তৃতীয় বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ মোটর উৎপাদকরা হল ঃ

ব্রাজিল, মেক্সিকো, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, মালয়শিয়া, তাইওয়ান, তাইল্যাণ্ড। দক্ষিণ কোরিয়া ১৯৮৭ সালে প্রায় আটলক্ষ মোটর গাড়ী উৎপাদন করে ছোট গাড়ীর বাজারে জাপানের বড় প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠছে। এই প্রসঙ্গে পূর্বোক্ত রিপোর্টের আর এক জায়গায় মন্তব্য করা হয়েছে ঃ

'হায়! (তৃতীয় বিশ্বে) সরকারি নীতিসমূহ আজ এমন হয়েছে যে দেশের অতিক্ষুদ্র শিক্ষিত ও স্বচ্ছল লোকেদের গাড়ীর মালিক হবার সাধকেই নানাভাবে সাহায্য করছে। এর ফলে মূল্যবান প্রাকৃতিক সম্পদাবলীর অপচয়ই শুধু ঘটছে না, উন্নয়নের তালিকায় যে সব বিষয়ের অগ্রাধিকার পাওয়া উচিত ছিল, সেই সব মার খাচ্ছে। পেট্রোলিয়াম আমদানী করতে, তৈরী করা গাড়ী বা গাড়ীর যন্ত্রাংশ কিনতে মূল্যবান বিদেশী মুদ্রা নষ্ট হচ্ছে। এই ভাবে রাস্তাঘাট হাইওয়ে ব্রীজ টানেল ইত্যাদি বানাতে ও

রক্ষণাবেক্ষণ করতে বিপুল অর্থ ও সম্পদ ব্যয়িত হচ্ছে" (যার দ্বারা এমন সব প্রয়োজনীয় কাজকর্ম করা যেত যাতে পরিবেশ ও জন সাধারণের স্থায়ী কল্যাণ হতে পারতো)।

কার লাভ ?

ভারতের মত অনুন্নত দেশগুলিতে কেন মোটর ও হাইওয়ের সম্প্রসারণ হয় এটা বুঝতে হলে আমেরিকা, পশ্চিম ইউরোপ, ইটালী, জাপান প্রভৃতি ধনতান্ত্রিক দেশগুলির ও অনুন্নত দেশগুলির আর্থ-সামাজিক অবস্থার দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। উন্নত দেশগুলিতে গাড়ীর বাজার বিশেষ বাড়ছে না ; আমেরিকাতে বহু মোটর ফ্যাক্টরী বন্ধ, লক্ষ লক্ষ লোক কর্মহীন হয়ে পড়েছে। ঐ সব দেশে মোটর বিরোধী মনোভাব ও পরিবেশ সচেতনতা বাড়ছে। ওদের সমস্যা কিছুটা কমে, যদি উন্নয়নশীল দেশগুলিতে নূতন বাজার পাওয়া যায়। কিছু বিদেশী কোম্পানী ও তাদের ভারতীয় সহযোগীদের নাম (বন্ধনীর ভিতর উল্লিখিত) দৃষ্টান্ত হিসাবে নিচে দেওয়া হল। সূত্র : Directory of Foreign Collaboration in India, N K Vyas Publishers, 1988 :

Daimler-Benz FRG (TELCO) Vauxhall motors Ltd. USA ; Athey Products Corporation, USA ; Isuzu Motors Ltd. Japan (Hindustan Motors, Calcutta) ; Hitachi, Japan (Kirloskar) ; Suzuki, Japan ; International Harvestors, USA (Maruti Ltd. Haryana) ; Standard Motor, UK (Standard Motor Products of India) ; Fiat SPD, Italy (Premier Automobiles) ; Honda Motor Co., Japan (Majestic Auto Ltd.

Ludhiana); Ford Motors, USA (Escorts Tactors Ltd.); Toyota Motor Co. Japan (Delhi Cloth Mills); Leyland Motors Ltd. UK (Ashok Leyland Ltd. Madras); Daimler AG, FRG (Bajaj Tempo Ltd.) ইত্যাদি ইত্যাদি।

অটোমোবাইলের বলি

সারা পৃথিবীতে প্রতিবছর মোটর দুর্ঘটনায় আড়াই লক্ষ মত লোক মারা যায় (১৯৮৫)। ভারত সরকারের প্রকাশনায় দেখছি সড়ক দুর্ঘটনায় ভারতে মৃত্যুর হার ঃ ১৯৭১এ ১১,৭৪০ ; ১৯৮০ তে ১৭,৪৮১ ; ১৯৮২ তে ২২,১৯১। আহতের সংখ্যা যে এর বহুগুণ তাতে সন্দেহ নাই এবং অনেক মৃত্যুই যে সরকারি পরিসংখ্যানে পৌঁছায় না তাও অনুমান করা যায়। প্রতি প্যাসেঞ্জার মাইলে উন্নতদেশ সমূহে যে হারে দুর্ঘটনা হয়, ভারতের মত অনুন্নত দেশ-সমূহে সেই হার প্রায় বিশগুণ। অটোমোবাইল ও হাইওয়ের চেয়ে রেল ভালো, সবদিক থেকেই। রেলপথ তৈরীর খরচ এক কিলোমিটার হাইওয়ে তৈরীর খরচের চেয়ে কম (আমেরিকার হিসাব)। হাইওয়ের খরচ রেলওয়ে তৈরীর খরচের ৩.৬ গুণ। রেলে প্রতি টন-মাইলে পরিবহনে শক্তি ব্যয় ৬২৪ BTU, আর মোটরে ৩৪৬০ BTU, প্রায় ছ'গুণ। ভারত সরকারের এক হিসাবে পাচ্ছি যে পরিমাণ মালকে জলপথে পরিবহন করতে লাগে এক টাকা, রেলে তা নিয়ে যেতে লাগে পাঁচ টাকা, সড়কপথে তেইশ টাকা আর বিমানে উনসত্তর টাকা। রেলে ও জলপথে বেশী মাল পরিবাহিত হলে লোকে বাজারে কম পয়সায় জিনিস পত্র কিনতে পারবে। অঞ্চলের জল নিকাশী ব্যবস্থা ব্যহত করতে হাইওয়ে ও রেল পথের প্রভাব তুলনীয়। তার মধ্যেও হাইওয়ের পরিবেশের উপর

কুপ্রভাব বেশী। হাইওয়ের সৌরকিরণ প্রতিফলিত করার ক্ষমতা (albedo) বেশী। মাটিতে বৃষ্টির জল প্রবেশেও হাইওয়ে বেশী বাধা দেয়। একটা মালগাড়ী যত মাল বইবে, তা বইতে কয়েক'শো ট্রাক লাগবে। স্পষ্টতঃই রেলপথে বায়ুদূষণ অনেক কম।

বায়ু দূষণ

মোটরের ইঞ্জিননির্গত ধোঁয়ায় প্রধান বায়ুদূষকরা হল: কার্বন মনোক্সাইড, কার্বন ডাইঅক্সাইড, অদগ্ধ বা আংশিক দগ্ধ হাইড্রোকার্বন নাইট্রিক অক্সাইডস্ এবং সীসা বাষ্প। মোটর চলে হাইড্রোকার্বন থেকে দহনে মুক্ত রাসায়নিক শক্তি থেকে। প্রাসঙ্গিক রাসায়নিক বিক্রিয়াটিকে নিম্নোক্তভাবে দেখানো যায়:

$$C_x H_y \xrightarrow{O_2} CO_2 \uparrow + H_2O \uparrow$$

কার্বন ডাইঅক্সাইড ও জলীয়বাষ্প কেউই বায়ুদূষক নয়। তবে কার্বন ডাইঅক্সাইড পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের "গ্রীনহাউস এফেক্ট" বাড়িয়ে পৃথিবীর তাপমাত্রা বাড়িয়ে আবহাওয়ার মারাত্মক ও সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন ঘটাতে পারে এবং ঘটাচ্ছেও। কিন্তু মুস্কিল হ'ল দহন যদি সম্পূর্ণ বা আদর্শ না হয়, তবে মোটর নির্গত ধোঁয়ায় অদগ্ধ বা অর্দ্ধদগ্ধ হাইড্রোকার্বন ও কার্বন মনোক্সাইড গ্যাস বেশী আসে এবং আরো আসে উচ্চতাপে ও ইঞ্জিনের বিদ্যুৎস্ফুলিঙ্গে উৎপন্ন নাইট্রিক অক্সাইড গ্যাস (NO_x)। মোটর যখন ট্রাফিক জ্যামে আটকে যায় বা ভীড় রাস্তায় ধীরে ধীরে চলতে বাধ্য হয়, তখনই তার নির্গত ধোঁয়ায় উপরোক্ত দূষকগুলি বেশী করে আসে। কার্বন-মনোক্সাইড গুরুতর বায়ুদূষক, যা রক্তের অক্সিজেন বহন ক্ষমতা নষ্ট করে মানুষ ও জীবজন্তুকে অসুস্থ এমনকি মেরেও ফেলতে পারে। নিউইয়র্কের বাতাসে থাকা আর দিনে দুপ্যাকেট সিগারেট খাওয়ার কুফল একই (১৯৭০ এর হিসাব)।

ভূপালের দুঃস্বপ্ন

নাইট্রিক অক্সাইড, অদগ্ধ-বা আংশিক দগ্ধ হাইড্রোকার্বন গ্যাস বাতাস থেকে অক্সিজেন, জলীয়বাষ্প এবং সূর্য্যালোক নিয়ে নানারকম আলোক-রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে বিস্তর বিষাক্ত (ক্যানসার উৎপাদক) রাসায়নিক পদার্থ বায়ুমণ্ডলে উৎপন্ন করে। এই ধরণের দূষণকে "ফোটোকেমিকেল স্মগ্" বলা হয়। এটা ১৯৪৩ সালে বাতাসে হলদে-বাদামী ধোঁয়ার মতন প্রথম দেখা যায় আমেরিকার লস্ এঞ্জেলস্ শহরে। এই ধোঁয়াকে লস্ এঞ্জেলস্ স্মগ্ও বলা হয়। এই ধোঁয়া উদ্ভিদ্ ও জীবজগতের পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকর। এতে বেশকিছু জারক দ্রব্য থাকে, যার ফলে বাড়ীর জিনিসপত্র, জামা-কাপড়, বইপত্র দ্রুত বিনষ্ট হয়। শস্যোৎপাদনও কমে, এতে PAN (Peroxyacetylnitate) নামে যে রাসায়নিক জন্মে তাতে কাঁদুনে গ্যাসের মতন গলা নাক ও চোখ জ্বালা করে। যেখানেই মোটরগাড়ীর আধিক্য, যানবাহন বড় বড় বহুতল বাড়ী থাকায় বাতাসের সুপ্রবাহ নাই, সেখানেই ফোটোকেমিকেল স্মগ্ বা সালোক-রাসায়নিক ধোঁয়া উৎপন্ন হয়। লস্ এঞ্জেলসে প্রথম দেখা গেলেও এখন পৃথিবীর নানাস্থানে—মেক্সিকো, নিউইয়র্ক, টোকিও, কলকাতায় এই বায়ুদূষণ দেখা যায়। শীতের কলকাতায় চৌরঙ্গী, বড়বাজার কলেজ স্ট্রীট, রাজাবাজার অঞ্চলে এই স্মগ্ অনুভব করা যায়। কলকাতায় যে হারে মোটর, জেনারেটর ও বহুতল বাড়ী ও লোক বাড়ছে, তাতে শীতের কলকাতায় কোন রাতে ব্যাপক অসুস্থতা, এমনকি ভূপালের গ্যাস কাণ্ডের মত ব্যাপক মৃত্যুর সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

সীসাবিষ ও আগামী প্রজন্ম

মোটর যানঘটিত বায়ুদূষণে সীসা বাষ্প আর একটি ভয়ঙ্কর বিষ যা প্রতিনিয়ত মানুষ, উদ্ভিদ্ ও জীবজগতে বিষ ছড়াচ্ছে।

মনুষ্যদেহে সীসা ক্রমসঞ্চয়ী বিষ, যার ক্রনিক টক্সিসিটি ভয়ঙ্কর। শরীরে অল্প-স্বল্প সীসা হজমের, দৃষ্টিশক্তির এবং স্নায়ুতন্ত্রের উপর কুপ্রভাব ফেলে। মনুষ্যদেহে সীসা প্রোটিন এনজাইমের সাথে যুক্ত হয়ে, তাদের কার্য্যকারিতা ক্ষুন্ন করে। সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয় সেই সব শিশুরা যারা বাস করে সেই সব রাস্তার ধারে এক তালায় যেখানে মোটর যান ঘটিত বায়ুদূষণ বেশী হয়। ১৯৭০ এর দশকের মাঝামাঝি আমেরিকায় কিশোর-কিশোরীদের ক্রমবর্দ্ধমান পড়াশুনায় অমনোযোগ, উচ্ছৃঙ্খল আচরণ ও অপরাধ প্রবণতার পিছনে এদের রক্তে সীসার আধিক্য কাজ করছে, এমন ভাববার বাস্তবসম্মত ভিত্তি পাওয়া গেছে। স্বাভাবিক বাতাসে যেখানে সীসা থাকে (প্রতি ঘন মিটারে) ০.০০০৫ থেকে ০.০০০৬ মাইক্রোগ্রাম, সেখানে বার্লিন নিউইয়র্ক লস্ এঞ্জেলসের বাতাসে পাওয়া যায় প্রায় ৩ থেকে ৪ মাইক্রোগ্রাম লেড। নিউইয়র্কের বাতাসে ১৯৪৬ সালে বছরে আসতো ৫০ হাজার টন লেড, ১৯৬৮ সালে সেটা বেড়ে হল ২৩০ হাজার টন।

চাই সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি ও পরিবেশ সচেতনতা

জলপরিবহনকে যত বাড়ানো যাবে ততই মঙ্গল, সবদিক থেকে মঙ্গল, বিশেষ করে নদীধৌত অঞ্চলগুলিতে, যা পলিতে গড়া ও সুগঠিত নয়। এখানকার পরিবহন ব্যবস্থাকে সমাজ উৎপাদন ব্যবস্থা ও প্রাকৃতিক পরিবেশ অনুযায়ী হতে হবে। ইউরোপ-আমেরিকা থেকে বিজ্ঞানের মোড়কে যা আসবে তাকেই বরণ করতে হবে, এমনটা সঙ্গত কি? লুই মামফোর্ডের একটি কথা এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে: "বেশীর ভাগ আমেরিকান যা নতুন তাকেই প্রগতি বলে ধরে নেয়; কারণ সেটা নতুন এবং পুরাতন বর্জন করে, কারণ সেটা পুরাতন। ব্যবসার পক্ষে এটা লাভজনক হতে পারে, কিন্তু জীবনের পক্ষে, তার স্থায়িত্ব ও ধারাবাহিকতার পক্ষে ভালো

নয়। জৈবিক অর্থে (organic sense) প্রগতি হবে ক্রমসঞ্চয়ী (cumulative) এবং যদিও পুরাতন ও জঞ্জাল সাফাই সব সময়েই কিছু প্রয়োজন, কিন্তু নূতন উদ্‌ভাবনের মূল্যবান লাভ আমরা কিছুটা হারাব যদি স্বভাবতই তার পূর্বেকার মূল্যবান উদ্ভাবনাদির সব কিছুই আমরা বর্জন করি। মোটরগাড়ী আসা মানেই পায়ে হাঁটা একেবারে বাতিল করতে হবে এবং কালক্রমে রেলও পরিত্যক্ত হয়ে যাবে এরকম ধারণা সঙ্গত নয়।"

নদী ও খালগুলির সংস্কার করে জলপরিবহনকে বাড়াতেই হবে। অন্তর্দেশীয় জলপরিবহন ব্যবস্থার উন্নতি পরিবহনের জন্যেও যেমন, নদীগুলির স্বাস্থ্য, বন্যানিয়ন্ত্রণ, সেচের জল, মৎস্যজীবীর জীবীকা ও গ্রামের মানুষের কর্মসংস্থানের জন্যও তেমন দরকার। পরিবহন ব্যবস্থাকে এমন করে গড়ে তুলতে হবে যাতে ডিঙ্গী নৌকো থেকে জেট বোট, স্টীমার থেকে রেলগাড়ী, বাইসাইকেল থেকে মোটরগাড়ী সকলেই যথাযোগ্য স্থান পায়। এ ব্যাপারে আমরা যে প্রকৃতি থেকে শিক্ষা নিতে পারি তা একটি উদ্ধৃতির মাধ্যমে দেখানোর চেষ্টা করবো ঃ

"যে ইকোসিস্টেম যতবেশী বৈচিত্র্য ও প্রজাতি বৈশিষ্ট্য সমন্বিত হয়ে গড়ে ওঠে, তার প্রাণশক্তি ও স্বাস্থ্য তত ভালো থাকে। মানুষ ও জিনিসপত্র পরিবহন ব্যবস্থাও তেমনি সবচেয়ে শক্তিশালী ও স্বাস্থ্যসমন্বিত হতে পারে, যদি তা বিভিন্ন ধরণের পরিবহন উপায়কে তার পরিবহন ব্যবস্থার মধ্যে যথাযোগ্য স্থান দিতে পারে। যে পরিবহন ব্যবস্থা একটি বা দুটি উপায়ের উপর নির্ভরশীল তার বিপর্যয় ও ব্যর্থতার সম্ভাবনাও তত বেশী।"—Michael Replogle, Institute for Transportation and Development Policy, Washington. The Futurist, March/April, 1989

দেশের বৈশিষ্ট্য ও প্রয়োজনকে উপেক্ষা করে উন্নয়ন চাপিয়ে দিলে কি হতে পারে বৃটিশ ভারতে রেল সম্প্রসারণ প্রসঙ্গে তা আমরা উল্লেখ করেছি। বন্যা, খরা নোনাজলের অনুপ্রবেশে ম্যালেরিয়া কৃষিকার্যহানি, মৎস্য উৎপাদন হ্রাস ইত্যাদি দুই বাংলাকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। বৃটিশ ভারতে রেলকে আটকাতে না পারলেও স্বদেশী নেতৃবৃন্দ 'রেল ও খাল' নিয়ে জোরালো বিতর্ক ও আন্দোলন সৃষ্টি করার চেষ্টা করে ছিলেন। অথচ আজ বিনা বিতর্কে নির্দ্বিধায় আমাদের পরিবেশ ও জনস্বার্থ জেনারেল মোটরস, ফোর্ড মোটরস, ডাইমলার, লেল্যাণ্ড, ফিয়াট, হিতাচি, ইসুজু, সুজুকি এদের পায়ে বিসর্জন দিচ্ছি। তা হলে এখন প্রশ্ন আসছে, পরিবেশ সচেতনতা ও পরিবেশ শিক্ষা প্রথমত ও প্রধানত কাদের জন্য ? স্পষ্টতই এটা শুরু হওয়া উচিত পরিকল্পনাকার, অফিসার, প্রযুক্তিবিদ্, এম. পি, এম. এল. এ, মন্ত্রী থেকে ; কারণ তাঁদের একটি সিদ্ধান্তে মানব পরিবেশের যা ক্ষতি অপূরণীয় ক্ষতি, হতে পারে লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষের সারা-জীবনের ভুলেও তা হতে পারে না।

□

মানব পরিবেশ ও তার মূলনীতি

* জড় পৃথিবী, জীবন সৃষ্টি করেছে ; জীবন তার প্রয়োজনে তার মত করে পরিবেশকে গড়ে নিয়েছে।

* লক্ষ লক্ষ বছর ধরে প্রকৃতি তার উদ্ভিদ ও প্রাণিজগৎ নিয়ে যে পরিবেশকে গড়ে তুলেছে, বিজ্ঞান-প্রযুক্তির বলে বলীয়ান আধুনিক মানুষ তাকে মূঢ়ভাবে বিনষ্ট করছে। মনে রাখা দরকার আমাদের একটাই দেশ আছে, আছে একটাই পৃথিবী।

* মানব পরিবেশ ও সমস্যা বুঝতে চারটি কেজো নিয়ম (যেগুলি হয়তো বিজ্ঞানের বিধি যথাযথ মেনে হয়নি) মনে রাখলে সুবিধে হবে। এদের কমোনারের ইকোলজীর বা বাস্তুবিদ্যার সূত্রাবলী বলা হয়। এগুলি সহজ প্রায় স্বতঃসিদ্ধের মত (দ্রষ্টব্য ঃ **The Closing Circle, by Barry Commoner, 1971**) ঃ

১। সব কিছুই অন্য কিছুর সাথে সম্পর্কিত। (ইকোলজীর মর্মবস্তু)

২। সব জিনিসকেই কোথাও না কোথাও যেতে হবে।
[এই দ্বিতীয় সূত্রে পদার্থের অবিনশ্বরতার দিকেই দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। ভৌত বিজ্ঞানের এই নীতি পরিবেশ দূষণ বোঝার বিশেষ সহায়ক]

৩। প্রকৃতিই সবচেয়ে ভাল বোঝে।
[মানবপরিবেশের বিবর্তনে থার্মোডাইনামিক্সের (তাপগতিবিদ্যার) দ্বিতীয় সূত্র যে অন্তর্দৃষ্টি দেয়, জৈবিক বিবর্তন ও প্রাকৃতিক নির্বাচনের সঠিক বোধ থেকে এই সূত্রটির যাথার্থ্য হৃদয়ঙ্গম করা যায়।]

৪। মুফৎ খাওয়া মেলে না।
[কোন লাভই মূল্য ছাড়া হয় না—অর্থনীতির এই মূল সত্য থার্মোডাইনামিক্সের দ্বিতীয় সূত্র দ্বারাও সমর্থিত। মূল্য দেওয়াটা কখনও বিলম্বিত করতে পারলেও এড়ানো যাবে না।]

পরিবেশ-সচেতনতা ও দূষণযন্ত্রণা ঃ আজকের ভাবনা

দেবাশিস্ চট্টোপাধ্যায়

ভূমিকা

প্রকৃতির স্পর্শ-বঞ্চিত এ প্রজন্মে। যন্ত্রসভ্যতার অপরিকল্পিত বিকাশে সঙ্কুচিত তার প্রাণচঞ্চল বনানী ; ধোঁয়ার আস্তরণে ঢাকা আকাশ। বিষ বাষ্পে ভরা বাতাস, দূষিত পানের ও স্নানের জল। কোনো অদৃশ্য শক্তির শাপে এই দুরবস্থা হয়নি। এ সবই মানুষেরই সৃষ্টি। 'সভ্যতার চালক' মানুষ সভ্যতার উষালগ্নে যে জয়লিপ্সা নিয়ে তার জয়যাত্রা শুরু করেছিল তারই উন্মাদনায় ঘটেছে প্রচুর ভ্রান্তি। যার ফলে আজ হয়ত সে বিনাশেরই পথে এগিয়ে চলেছে।

আজ বাঁচতে হলে চাই পৃথিবীতে পুনরুজ্জীবিত পুনঃপ্রসারিত সেই সবুজ-বিমল পরিবেশ। ভাগ্য ভালো যে এই সম্বিৎ ফিরে এসেছে। তবে দুঃখের কথা সম্বিৎ ফিরলো ত্রাসে—'মৃত্যুর উপত্যকায়'। ১৯৭২ সালের জুন মাসে ষ্টকহোমে জাতি সংঘের আহূত বিজ্ঞান ভিত্তিক আন্তর্জাতিক আলোচনার এক সভায় উপস্থিত রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধিবর্গ পরিবেশকে দূষণমুক্ত করার এক তাৎপর্যপূর্ণ শপথ-

নেয়। সভার মূলনীতি ও আগামী দিনের কর্মপন্থা (UNEP) সেখানে চিহ্নিত হয়। সত্তরের দশককে দূষণ মুক্তির দশক রূপে নির্ধারণ করা হয়। সেই থেকেই শুরু হয় সভ্যতার দূষিত রক্ত শোধনের অভিযান।

বিগত দশকে পরিবেশ দূষণ ও তার উদ্ভুত সংকট আলোড়ন তুলছে সারা বিশ্ব জুড়েই। মুক্তির জন্য রাষ্ট্র সংঘ নিয়েছে একাধিক প্রস্তাব। প্রতিনিধিবর্গরা অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছেন ১৯৯০ সালের মধ্যে সকলের জন্য বিশুদ্ধ জল ও যথোপযুক্ত স্বাস্থ্যকর ব্যবস্থা করা ও ২০০০ সালের মধ্যে ক্ষতিকারক জ্বালানীর ব্যবহার কমানো বা বন্ধ করা ইত্যাদি প্রস্তাবের বাস্তবায়নে। কিন্তু কেবলমাত্র রাষ্ট্রসংঘের প্রচেষ্টায় সংকটমুক্ত হওয়া সুদূর পরাহত। এমনকি রাষ্ট্রসমূহ ও সরকার সমূহও এ কাজে সাধারণের সহযোগিতা বাদ দিয়ে তেমন কিছু করতে পারবেন না। সুতরাং আশু ফল লাভের জন্য প্রয়োজন সারা বিশ্ববাসীর পরিবেশ সচেতনতা। সেই সঙ্গে দূষণের চরিত্র মূল্যায়ন ও তার পরিমাপ এবং প্রকৃতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হওয়া। এ সব ধারণা থেকেই জন্ম নেবে দূষণ প্রতিরোধের গণআন্দোলন।

পরিবেশ চেতনা

পরিবেশ আজ ভারসাম্যহীন। হতশ্রী ও অসুস্থতার লক্ষণ তার সর্বাঙ্গে কিন্তু আমাদের অতীতের, বিশেষ করে দূর অতীতের চালচিত্র, ছিল সুস্থ এবং উজ্জ্বল। সুতরাং বর্তমান প্রজন্মকে পরিবেশের পালা-বদলেব ইতিহাস পরিষ্কার ভাবে বুঝতে হবে এবং তুলে ধরতে হবে।

পরিবেশ হচ্ছে সেই সমস্ত ভৌতিক ও জৈবিক অবস্থার সমন্বয় যা জীবের অস্তিত্বকে প্রতিনিয়ত প্রভাবিত করে চলেছে। আমরা জানি যে মাটি, জল ও বায়ু—এই তিনটি হ'ল পৃথিবীর মৌলিক

ভৌতিক উপদান। জিন্, কোষ ও প্রাণী হচ্ছে জৈবিক উপাদান। এ সবই অজৈবিক উপাদানের সাহায্যে পৃথিবীর জৈবিক নিয়মদ্বারা গঠিত ও পরিচালিত হচ্ছে। যেমন কোষ পদার্থ ও শক্তির দ্বারা রূপ নিচ্ছে কোষ তন্ত্রে। পরিবেশ হচ্ছে একটি জৈবিক ও ভৌতিক উপদানের দ্বিমুখী সম্পর্ক যার প্রভাবে জীবের অস্তিত্ব সর্বস্তরে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে এবং উন্নতও হচ্ছে। পরিবেশ কেবলমাত্র মানুষ, বাতাস, জল এবং মাটিই নয় বরং মাটির ব্যবহার, তার বিভিন্ন জীব-জন্তু ও গাছ-পালা, পর্বত, আকাশ, নদী ও তার জলজ প্রাণী, বিভিন্ন শক্তি ও তার রূপান্তর, সর্বোপরি এদের মিলিত যোগফলের ও তার অন্তর্নিহিত যোগসূত্রের চিরবিবর্তনশীল প্রতিকৃতি। মাতৃজঠরে ভ্রূণ লালিত হয় গর্ভনাড়ীর দ্বারা আর সমগ্র মনুষ্যজাতির গর্ভনাড়ী-হল পরিবেশ, যা ধারণ করে আছে ৬০,০০০ মানুষের শহর বা ৬০ লক্ষের দেশ অথবা প্রায় ৫২০ কোটি জনসংখ্যার বিশ্ববাসীকে।

সভ্যতার ঊষালগ্ন থেকেই পরিবেশের তিনটি মৌলিক ধর্মের সঙ্গে মানুষ সংসর্গযুক্ত। মানুষের প্রয়োজনের সিংহভাগ সংগৃহীত হয়েছে পরিবেশ থেকে। যেমন খাদ্য, শক্তি আকরিক ও ধাতু। সুতরাং পরিবেশ মানুষের প্রয়োজনের এক বিপুল উৎস। প্রতি-নিয়ত আমাদের প্রয়োজন মিটিয়ে নেবার পর আমরা নিক্ষিপ্ত করছি আর্বজনার স্তূপ এবং বিষাক্ত বর্জ্য পদার্থ। সভ্যতার সুরু থেকেই পরিবেশ হচ্ছে আর্বজনার উন্মুক্ত বর্জনভূমি বা পতিত আধার। পরিবেশের অপর মহৎ ধর্ম্ম হল তা মানুষের চিত্ত বিনোদনের এক অফুরন্ত ভাণ্ডার। যেখানে আছে দিগন্ত বিস্তৃত আকাশ, যেনিল জলরাশি, সবুজ ধরিত্রী, বিচিত্র জীব-জন্তু, রঙ-বেরঙের পশু ও পাখি, জলজপ্রাণী, প্রাকৃতিক দৃশ্য, তুষারশুভ্র গিরিমালা। মানুষের জীবনকে এসব করে তোলে মধুময়, মনকে করে মুক্ত এবং মানসিকতাকে করে উদার।

পরিবেশ ও মানুষ

বিক্রম ও বুদ্ধির বলে মানুষ যখন সবেমাত্র জীব-জগতের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করছে তখনই আবিষ্কার হল আগুন। খাদ্য, বস্ত্র ও আশ্রয়ের জন্য শুরু হল আরও ব্যপকতর অনুসন্ধান। পরিষ্কার হল বন-জঙ্গল। দেখা দিল পশু পালন এবং চাষ ক্রমবর্ধমান অনুপাতে। এলো সঞ্চয়। এ ভাবে ক্রমশঃ মানুষের প্রয়োজন এবং চাহিদার তালিকা হল দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর। গুহাবাসী মানুষ হ'ল গৃহবাসী। মানুষ পরিবেশের চলার ছন্দে বিঘ্ন ঘটালো। সে পরিবেশকে জয় করার নেশায় মগ্ন হল।

ক্রমশঃ নিশ্চিহ্ন হল অরণ্যরাজ্য, গড়ে উঠলো বসতি ও গ্রাম। অর্থনীতির ধারাবদলের সঙ্গে এলো শহর। অঙ্কুরিত হল নগর সভ্যতা। মানুষ হল পুরবাসী। লোভ ও সে-সঙ্গে গরীব উৎপাদকের বাজার গড়বার তাগিদে দ্রুত হল নগরায়ন। তার অনেক পরে অনেক অদল বদলের পর এলো শিল্প। শিল্পের জন্য প্রয়োজন শক্তি আর কাঁচামাল। শক্তির আহরণের পালায় মানুষ প্রথম হাত বাড়ালো অরণ্য রাজ্যে। সংগ্রহ করলো কাঠ।

উন্নতমানের বিচিত্র ধরণের যন্ত্রপাতির চাহিদা পূরণের জন্য পাতালও খুড়তে হ'ল, এভাবে হলো নানা ধাতুর আবিষ্কার। সঙ্গে জানতে হলো ধাতুবিদ্যা, এ পথেই তৈরী হলো অভিজ্ঞ শ্রমিক। ত্বরান্বিত হলো সভ্যতার গতিশীলতা। গতিময়তা ধরে রাখতে প্রয়োজন হলো নতুন শক্তির উৎস। আবিষ্কার হলো মাটির তলার বিপুল শক্তির ভাণ্ডার—কয়লা, তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস। নীল আকাশ কালো হলো চিমনির ধোয়ায়, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির মণিকাঞ্চনে জীবন-যাত্রার মান হ'ল মসৃণ এবং উন্নত। যন্ত্রচালিত যান সমূহ ভূ-পৃষ্ঠে এবং বায়ুপথে দূরকে করলো নিকট। যন্ত্র নির্ম্মিত

শিল্প সামগ্রীর ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য প্রয়োজন দেখা দিল নিত্য নতূন বাজারের। বিশ্ববাসী এই কাড়াকাড়ির ফলে উপহার পেল দুটো বিশ্বযুদ্ধ। যুদ্ধের প্রয়োজনে বিজ্ঞানের দান বিভিন্ন প্রাণনাশক হাতিয়ার, বিষাক্ত গ্যাস, পারমাণবিক বোমা। এ শতাব্দীর শেষ ভাগে মানুষ ঘটিয়েছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির চরমতম বিকাশ। যার সহগামী পরিণাম অতি দ্রুত গতিশীল জীবনযাত্রা। মানুষ এখন যাত্রা করছে গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে। মানুষ প্রমাণ করতে পেরেছে জীব-জগতে সেই শ্রেষ্ঠ। সুতরাং সে-ই এখন একমাত্র পরিবেশের 'পরিচালক'। এ হলো বিগত বছর-সমূহের আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব উন্নতি ও বিকাশের ইতিহাসের এক সংক্ষিপ্ত চিত্র। এই পরিবেশ জয়লিপ্সা আবার দূষণ-যন্ত্রণার নেপথ্যের ইতিহাস।

দূষণ যন্ত্রণা

আধুনিক জীবনযাত্রা উন্নতির আকাঙ্ক্ষা শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের বাসনা, এ-সর্ব আজ ঘটছে পরিবেশের বিনাশ ঘটিয়ে। জনবিস্ফোরণের ফলে টান পড়েছে খাদ্যশস্যের মজুত ভাণ্ডারে। বাঁচতে হলে আরও খাদ্য চাই, সুতরাং উৎপন্ন কর আরও বেশী ফসল। সুতরাং মাটিতে দিতে হয়েছে অধিক পরিমাণে সার, সেইসঙ্গে তীব্র কীটনাশক এবং অধিক ফলনশীল বীজ। তাই এ যুগের অমৃতস্য পুত্র-পুত্রীদের সাময়িক চাহিদার ক্ষুধা পূরিত হচ্ছে ঈপ্সিতউৎপাদনে আর তার উপজাত নিঃসারিত বিষে দূষিত হচ্ছে, ভূমি বাতাস ও জল। আজ গঙ্গা দূষিত, দামোদর বিষময়। চিমনি, যানবাহন ও গৃহস্থের উনুনের ধোঁয়ায় আজ গ্রামের আকাশ কালচে। আজ প্রায় চারশ প্রজাতির বন্যপ্রাণী বিলুপ্ত এবং হাজার সংখ্যক বিলুপ্তির পথে। উন্নত এবং অনুন্নত দেশগুলি আজ চিন্তামগ্ন কারণ পৃথিবীর উপরিস্থিত বায়ুমণ্ডলের ওজোনের ছাতায় ধরা পড়েছে ছিদ্র। 'বিশ্ব' গ্রীন

হাউস এফেকট'র ভয়ে কম্পমান। ইথিওপিয়ার দুর্ভিক্ষে যার সূচনা তার পরিণতি কোথায় কে জানে! আর কতগুলো ইথিওপিয়া আমাদের দেখতে হবে?

কিন্তু, এই কি ঈপ্সিত ছিল? জীবনযাত্রার উষা লগ্নে ঋষির কণ্ঠে দৃপ্ত হয়েছিল 'চরৈবেতী, চরৈবেতী' কিন্তু আজ প্রশ্ন, কি ঘটছে? অগ্রগতি না পশ্চাদপসরণ! উন্নতি নাকি ধ্বংস? কোথায় চলেছি? মানুষ প্রতিনিয়ত লড়াই করছে তার নিজের তৈরী পরিবেশের মৃত্যুবাণের সঙ্গে। পিতামহ ভীষ্ম আঘাত সয়ে ছিলেন অন্যদের একগুঁয়েমির জন্য আর আমরা নিঃশব্দে বুক ভরে মৃত্যুবাণ নিচ্ছি নিজেদেরই লোভ, বাসনা, অজ্ঞতা ও অপদার্থতার জন্য।

পরিবেশ ও বিশ্বের ভাবনা

দূষণের কোনো সাদা ও কালোর সীমারেখা নেই। মানে না ভূগোল। উন্নত পৃথিবীর সালফার-ডাই-অক্সাইড যেমন উন্নত অনুন্নত বিশ্বকে অ্যাসিডের বৃষ্টিতে ভাসিয়ে দিচ্ছে। পৃথিবীর উপরিস্থিত বায়ু-মণ্ডলের স্তর গঠিত ওজোন দিয়ে। যা পৃথিবীর পরিবেশকে রক্ষা করছে অতিবেগুনী রশ্মির প্রকোপ থেকে। একে বলা হচ্ছে ওজোনের ছাতা। যার ছিদ্রের ছবি তোলা হয়েছে। এর জন্য প্রধান দায়ী chlorofhurocarbons (CFC)-এর অধিক মাত্রায় ব্যবহার। এই নিষ্ক্রিয় বিষহীন যৌগটি বহুল অংশে ব্যবহার হচ্ছে অপরিবাহী. শীতলকারক এবং দ্রুতগামী বিমানের জ্বালানী রূপে। বর্তমানে সারা বিশ্বে বছরে এর ব্যবহার ১১ লক্ষ টন (দাম ২০০ কোটি ডলার)। গতিশীল উচ্চমানের জীবনযাত্রার জন্য এক রকমের বিচারে এটা অপরিহার্য্য। তবে এর মোট উৎপাদনের ৯০ ভাগ ব্যবহার করে বিশ্বের উন্নত এবং ১০ ভাগ অনুন্নত দেশ সমূহ (আমাদের দেশে প্রায় ৬০০০ হাজার টন)। এই ছাতাকে বাঁচাতে গেলে এর ব্যবহার অচিরেই চিরতরে বন্ধ

করতে হবে। কারণ CFC র আলোক বিশ্লেষণ (ফোটোডিসো শিয়েশন্) প্রক্রিয়ার ফলে ক্লোরিনের একাধিক অণু তৈরী হয় যা আস্তেআস্তে গ্রাস করছে ওজোনের স্তর। এক অণু CFC ধ্বংস করতে সক্ষম একলক্ষ অণু ওজোনকে এবং এই ক্ষমতা বজায় থাকে ৭৫ থেকে ১০০ বছর।

ওজোনের ছাতায় ছিদ্রের ফল হবে মারাত্মক। কারণ অধিক পরিমাণে অতিবেগুনী আলোর রশ্মি ভূ-পৃষ্ঠে এলে মানুষের হবে বিভিন্ন শারীরিক পীড়া। ব্যাপক আকারে দেখা দেবে ক্যান্সার জনিত চর্মরোগ, চক্ষুপীড়া এবং কমে আসবে মানুষের দেহের সহজাত প্রতিরোধ ক্ষমতা। সেই সঙ্গে অধিকাংশ জলজপ্রাণী এবং গাছ-পালার পক্ষে আসবে এক ভয়ঙ্কর দুঃসময়।

আশার কথা ১৯৮৭ সালের মনট্রিল. দলিলের খসড়া অনুযায়ী বিশ্বের প্রায় ৫০টি দেশ সম্মত হয়েছে ২০০০ সালের মধ্যে এর উৎপাদন অর্ধেক বা বন্ধ করতে। যদিও তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি এর বিরোধিতা করেছে কারণ ওজোনের স্তরের ক্ষয় ও CFC এর ব্যাপক ব্যবহার মূলতঃ শিল্পপ্রধান দেশের তৈরী সমস্যা। সুখের বিষয় গত বছর হেল্‌সিংকির বৈঠকে ঠিক হয়েছে একটি আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল গড়ে তোলা হবে যাতে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি সহজেই এ সমস্যার মোকাবিলা করতে পারে।

CFC ছাড়া ওজোনের স্তরকে ক্ষয় করতে পারে নাইট্রোজেনের বিভিন্ন অক্সাইড (NO, NO_2)। মানুষের বিভিন্ন ক্রিয়া কলাপের জন্য এই গ্যাসসকলের পরিমাণ বাতাসে ক্রমশ বাড়ছে। এর ফল কিন্তু মারাত্মক। কারণ প্রাকৃতিক উৎস থেকেও এদের প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। এই গ্যাসসকল নির্গত হচ্ছে উচ্চস্তরীয় বায়ুমণ্ডলের দ্রুতগামী বিমানের এন্‌জিন থেকে জ্বালানীর

অধিক তাপমাত্রায় দহনের ফলে। এরা আলোক বিক্রিয়ার সাহায্যে সহজেই হ্রাস করে ওজোনের স্তর। সারাবিশ্বে প্রতি বছর অধিক ফসল ফলাবার জন্য ব্যবহার হচ্ছে প্রায় ৩০০ লক্ষটন ইউরিয়া। এই যৌগটি মাটির জীবাণুর সংস্পর্শে নির্গত করছে প্রচুর পরিমাণে নাইট্রোজেনের অক্সাইড এবং এর একটি বিরাট অংশ জমা হচ্ছে উচ্চস্তরীয় বায়ুমণ্ডলে। সুতরাং মানুষের দৈনন্দিন ক্রিয়া কলাপই সভ্যতাকে ক্রমেই ঠেলে দিচ্ছে ধ্বংসের দিকে। অতএব আশুকরণীয় হল সারা বিশ্বজুড়ে বিকল্প পদ্ধতি একবলিষ্ঠ জনমত গড়ে তোলা যাতে ওজোনের ছাতা বহাল তবিয়তে আমাদের উপর ছত্রধারণ করে থাকতে পারে।

নানা কারণে এখন সারা বিশ্বে আবহাওয়ার ব্যাপক রদ-বদল হচ্ছে এবং আগামী দিনে এর হার আরও দ্রুত হবে। দায়ী 'গ্রীন হাউস এফেকট"। যার পরিবর্ত্তনের ফলে ভূ-গোলকের তাপের ভারসাম্যতা বিঘ্নিত হবে। UNEP-র প্রতিবেদনে বলা হয়েছে মানবজাতির ক্রিয়াকলাপের ফলে বাতাসে বাড়ছে CFC এবং অন্যান্য নানা গ্যাসের পরিমাণ। যারা শোষণ করছে ভূ-পৃষ্ঠ থেকে নির্গত বায়ুমণ্ডলের তাপ। এদের মধ্যে কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাসের ভূমিকাই প্রধান। যার মূল উৎস হল—জীবাশ্মজ্বালানী অর্থাৎ কয়লা, তেল, এবং প্রাকৃতিক গ্যাস। এ সব যখন পরিবেশে পোড়ানো হচ্ছে তখন লক্ষ লক্ষ বছর ধরে পুবীভূত কার্বন বায়ুমণ্ডলে ফিরে যাচ্ছে কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস রূপে। বিগত ৩০ বছরে হওয়াই দ্বীপপুঞ্জে (দূষণ মুক্ত অঞ্চল রূপে চিহ্নিত) গবেষণা লব্ধ পরিসংখ্যান প্রমাণিত করেছে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের মাত্রা ৩১·৫ লক্ষাংশ থেকে বেড়ে ৩৪·৯ লক্ষাংশ হয়েছে। যে মাত্রা মেরু-বরফের বুকের মধ্যে আবদ্ধ ১ লক্ষ ৮০ হাজার বৎসর পুরোন বাতাসের বুদবুদের থেকে অনেক অনেক বেশী। সুতরাং বায়ুমণ্ডলেও এ গ্যাসের মাত্রা

প্রচুর বাড়ছে। সূর্য্যর বিকিরণ থেকে নির্গত অতিবেগুনি আলোর রশ্মিকে এই গ্যাস শোষণ করতে পারে খুবই কম মাত্রায়। সুতরাং এর মাত্রার বৃদ্ধি হলে অতিবেগুনি আলোর প্রকোপ কমছে না যার ভয়াবহ প্রভাবের কথা আগেই বলেছি। তবে এই কার্বন যৌগটি সহজেই শোষণ করে অবলোহিত তরঙ্গ দৈর্ঘ্যকে যা ভূ-পৃষ্ঠ থেকে প্রতিফলিত তাপ বিকিরণ রশ্মির মধ্যে সর্বাধিক। ফলে পৃথিবী থেকে যে পরিমাণ তাপশক্তি মহাশূন্যে নির্গত হওয়া উচিত তার পরিমাণ কমে যাবে অর্থাৎ ভূ-পৃষ্ঠের তাপমাত্রা আরও বাড়বে। UNEP থেকে ঘোষণা করা হয়েছে ২০২৫ সালের মধ্যে এই বাড়ার পরিমাণ ১.৫ ডিগ্রী থেকে ৪.৫ ডিগ্রী এবং সমুদ্রের জলের উচ্চতা বাড়বে প্রায় ২০ সেন্টিমিটার। ধরে নিতে পারি তেমন হলে দার্জিলিং-এ গরমে গিয়ে বিশেষ লাভ হবেনা। সুন্দরবনের অধিকাংশ বসতিই চিরতরে জলে ডুববে। ডুববে আরও দেশ, নগর ও গ্রাম।

পরিবেশের একটা নিজস্ব পাকাপাকি বন্দোবস্ত আছে যাতে এ গ্যাস মাত্রাতিরিক্ত না হয় যেমন সালোক সংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদ-জগৎ ও সমুদ্রের এই গ্যাস ব্যবহার। কিন্তু বাস্তবে অরণ্যতো প্রায় নিঃশেষিত, বিশেষ করে গ্রীষ্মমণ্ডলের অরণ্যানি। মানুষের হাতেই দ্রুত নিঃশেষ হচ্ছে কমবসতি পূর্ণ ব্রেজিলের অরণ্যরাজ্য থেকে ঘনবসতি পূর্ণ বাংলাদেশের ব-দ্বীপ সমূহ। সারা বিশ্বে প্রায় এক লক্ষ বর্গ কিলোমিটার অরণ্য প্রতি বছর নিঃশেষিত হচ্ছে। আমাদের দেশেও বাদ যায়নি, কেরালার নিঃশব্দ উপত্যকা (সাইলেণ্ট ভ্যালী) থেকে মহারাষ্ট্রের সীমানা পর্যন্ত দক্ষিণ ঘাট পর্বতমালা, বিহারের মালভূমিসমূহ এবং হিমালয়ের পাদদেশ সবই ন্যাড়া হয়ে পড়েছে। এই হার যদি অবিলম্বে না কমানো হয় তবে বনমহোৎসব এবং বন-সৃজন পরিকল্পনার সুফল হবে সুদূর পরাহত। কারণ যে হারে

কার্বন-ডাই-অক্সাইডের মাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে সারা বিশ্ব জুড়ে তাকে অপসারিত করতে হলে প্রতি বছর ফ্রান্সের সমপরিমাণ এলাকায় স্থায়ী অরণ্য রাজ্য গড়ে তোলা প্রয়োজন। অন্যদিকে কার্বন ডাই-অক্সাইড অপসারণের ফলে দ্বিতীয় বিশাল প্রাকৃতিক ভাণ্ডার হল সমুদ্র। যেখানে এই গ্যাস সহজেই দ্রবীভূত হয় রাসায়নিক প্রক্রিয়ায়। এই সহজে দ্রবণীয় গ্যাস অধিকাংশই ব্যবহার হয় সমুদ্রনিবাসী বিরাট উদ্ভিদ জগতের জীবন ধারণের জন্য। কিন্তু বিপদ ঘটবে যদি অধিক মাত্রায় আসা অতিবেগুনি রশ্মির দ্বারা ধ্বংস হয় সমুদ্রের উদ্ভিদ্‌ পরিবার। সেদিন যে পরিমাণ কার্বন-ডাই-অক্সাইড মুক্ত হবে বায়ুমণ্ডলে তাতে ভীষণ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে পৃথিবীর তাপশক্তির ভারসাম্যতা এবং জীবনধারণও হয়ে উঠবে অসম্ভব।

পৃথিবীতে কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাসের পরিমাণ এবং ভূ পৃষ্ঠের বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা ক্রমশ বাড়ছে। মেরু প্রান্তের বরফের চাদর গলতে শুরু করছে। ঘটছে ভয়ঙ্কর সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস ও জল প্লাবন। সেই সঙ্গে প্লাবিত সমুদ্র তীরবর্ত্তী নীচু এলাকা। অপ্রত্যাশিত ঘূর্ণিঝড় এবং কালবৈশাখী হচ্ছে বিশ্বজুড়ে। মরুভূমিগুলির শুষ্কতা ও আয়তন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই সঙ্গে আবহাওয়া ও বৃষ্টিপাতের ব্যাপক রদ-বদল হচ্ছে ফলে দুর্ভিক্ষ, বন্যা ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে মানুষ, উন্নত ও অনুন্নত উভয় দেশের অর্থনীতির উপর এর চাপ পড়ছে। এ অবস্থায় তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হবে, তাদের অন্তর্নিহিত দুর্বলতার ফলে। তাদের উন্নয়নমুখী পরিকল্পনার কাজ বাধাপ্রাপ্ত হবে যদিও সবুজ বিশ্ব ধ্বংসকারী গ্যাস সমূহের বেশীর ভাগটাই তৈরী করে শিল্প প্রধান দেশসমূহ।

সুতরাং আজ জীবাশ্ম জ্বালানীর ব্যবহারে চাই সংযম। শক্তির স্বল্পব্যয়ের জন্য চাই বিশ্বব্যাপী সচেতনতা। মনে হয় এ অবস্থায়

বাধ্যতামূলক করা উচিত শক্তির সঙ্কোচনকে। যদিও তার ফলে বাধা প্রাপ্ত হবে আধুনিক উচ্চমানের দ্রুতগতির জীবন-যাত্রা। দূষণরহিত শক্তিগুলির (সৌর, বায়ু, জোয়ার-ঢেউ, ভূ-গর্ভস্থ তাপ) ব্যাপক ব্যবহার এবং নতুন শক্তির উদ্ভাবনের জন্য গবেষণা। এ জন্যে এক প্রয়োজনীয় অর্থ তহবিলও গড়ে তুলতে হবে। প্রয়োজন উপযুক্ত গণ-আন্দোলনের সাহায্যে নির্বনীকরণ নিয়ন্ত্রণ এবং ব্যাপক হারে বৃক্ষরোপণ উৎসব শুরু করা বিশেষ ভাবে গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলে।

আজকের বিশ্বে অপর এক শক্তির ভাণ্ডার হলো পরমাণু শক্তি। পরমাণুর বিভাজন অথবা মিলনে পাওয়া যায় অমিতশক্তি। এক অণু ইউরেনিয়মের (^{235}U) বিভাজনে উৎপন্ন হয় ২০০Mev, আর এক অণু কার্বনকে পোড়ালে পাওয়া যায় মাত্র ৪ ev। সুতরাং পরমাণুশক্তির জয় জয়কার। কিন্তু এর রুদ্রমূর্তি সম্বন্ধে চিন্তাও প্রয়োজন। কারণ এর ভয়াবহতার স্মৃতিচারণে জায়গা করেছে Three Mile Island, Chernobyl, হিরোসিমা, নাগাসাকি। পরমাণুশক্তির তেজস্ক্রিয়তা মানবদেহে ও পরিবেশের পক্ষে মারাত্মক। বিস্ফোরণ অথবা বিদ্যুৎ প্রকল্পের থেকে নিষ্কাশিত পরমাণবিক তেজস্ক্রিয়তা আকাশ, বাতাস, মাটি এবং জল সর্বত্র কলুষিত করছে। প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ভাবে এ সব প্রবেশ করছে গাছ-পালা ও জীব-জন্তুর শরীরে। শাক-সব্জি, ফল, দুধ, মাছ, মাংস এবং ডিম ইত্যাদি আহার্যের মাধ্যমে অনুপ্রবেশ করেছে মানুষের শরীরে। Strontium-90, cesium-137 এবং iodine-137 এরা ধীরে ধীরে জমা হচ্ছে মানুষের শরীরে। এদের মধ্যে প্রথমটি করে হাড়ের ক্ষতিসাধন এবং মাত্রা বেশী হলে রক্তের ক্যান্সার, দ্বিতীয়টি দ্বারা নষ্ট হয় নরমপেশী সকল এবং ক্ষতিগ্রস্ত হয় মানুষের শরীরের জিনসমূহ। শেষেরটি এবং প্রথমটিও সাধারণত গরুর দুধের মধ্যে দিয়ে সংক্রামিত হয়। শরীরের থাইরয়ড গ্রন্থি (উল্লেখযোগ্য

ভাবে বাচ্চাদের) আকারে ছোট হতে থাকে এবং সৃষ্টি করে বিভিন্ন শারীরিক সমস্যার। আণবিকশক্তি চালিত বিদ্যুৎ প্রকল্পের নিঃশেষিত তেজস্ক্রিয় বর্জ্য পদার্থের পরিবেশে জমা করা ও ফেলে রাখার সমস্যা আরও ব্যাপক এবং আরেক দুর্ভাবনার সৃষ্টি করছে। আরও চিন্তার কারণ হয়েছে দুই বৃহৎ শক্তির পরমাণু অস্ত্রের মজুদ ভাণ্ডার। সুতরাং পৃথিবীর ধ্বংসের এই 'হাতিয়ার' কে কবর দিতে হবে এ গ্রহে বা অন্য গ্রহে, কারণ 'পৃথিবী একটাই'—এটাই আজকের ভাবনা।

বর্তমানে মানুষের সৃষ্টি রাসায়ণিক দ্রব্যের সংখ্যা প্রায় ৯০,০০০। ১৯৮৫ সালের সারা দুনিয়ায় রাসায়নিক পদার্থ সমূহের মোট উৎপাদন হয়েছিল প্রায় তিন হাজার লক্ষ টন। এর মধ্যে সার ও কীট-নাশকের পরিমাণ আটশো লক্ষ টন, যা মাঠে ঘাটে ছড়ানো হয়েছে। নিত্য নতূন রাসায়নিক পদার্থ বাজারে আসছে। তামাম রাসায়নিক পদার্থসমূহের বিষক্রিয়ার স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব এবং বিষ-বিজ্ঞানের বিস্তারিত তথ্য আজও নথিভূক্ত হয়নি। বহুজাতিক সংস্থা সমূহের দ্বারা কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত জীবনদায়ী ঔষধ, টিকা ইত্যাদির আমাদের শরীরে প্রয়োগের পর প্রতিক্রিয়ার ক্ষতিকর প্রভাব ক্রমশ পরিলক্ষিত হচ্ছে এবং আজও এগুলির মূল্যায়ন হয়নি। এই বহুজাতিক সংস্থার 'মারণখেলা' বন্ধ করার জন্য ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সচেষ্ট হতে হবে।

পৃথিবীতে ক্রমবর্ধমান মানুষের সংখ্যা ও তার চাহিদার যোগান দিতে প্রতিনিয়ত নিঃশেষ হচ্ছে প্রাকৃতির সম্পদ। উন্নত পৃথিবীতে সম্পদের জন্য তীব্র ব্যাকুলতা ও অনুন্নত পৃথিবীর জনসংখ্যা-জনিত পরিস্থিতির চাপে সুস্থ জীবনধারণের জন্য অতি প্রয়োজনীয় প্রাকৃতিক সম্পদের মাত্রাতিরিক্ত ক্ষয় হচ্ছে। ধনীদেশগুলিতে

পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার প্রায় ৩০ শতাংশ বাস করে আর সেই সব দেশের মানুষেরা ব্যবহার করে বিশ্বের ৮০ শতাংশ সম্পদ ; সুতরাং অনুন্নত দেশের অধিবাসীদের জন্য সামান্য সম্পদই অবশিষ্ট থাকে। আজকের বিশ্বে সুস্থ ও শুভ পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে এই বৈষম্যের আশু সমাধান প্রয়োজন। এর মূল ভূমিকায় থাকতে পারেন জাতিসংঘ। এরই সংঙ্গে সংঙ্গে তৃতীয় বিশ্বের দেশ গুলিতে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য জনসচেতনতার সাহায্যে সরকারী ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন যাতে তার সুফল কৃষক, শ্রমিক ও শ্রমজীবীর মধ্যে দ্রুত সঞ্চারিত হয়।

সরকারী স্তরে ভাবনা

সরকার (কেন্দ্র ও রাজ্য) দূষণ মোচন করতে চাইছেন. তৈরী হচ্ছে পরিকল্পনা এবং জনপ্রতিনিধিরা অনুমোদন করেছেন একাধিক বিল ও আইন। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য—

১। The Environment (Protection) Bill 1986 ;
২। Air (Prevention and Control of Pollution) Act 1981 ;
৩। Water (Prevention and Control of Pollution) Case Act 1977 ;
৪। Water (Prevention and Control of Pollution) Act 1974 ;
৫। Indian Factories Act 1948 ; এবং
৬। Bengal Smoke-Nuisances Act 1905।

এদের মধ্যে প্রথমটি হল পরিবেশের রক্ষাকবচ। এর চারটি অধ্যায়, ২৬টি ধারা এবং সংবিধানের ১১৭ (৩) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী এটি রাষ্ট্রপতির অনুমতিপ্রাপ্ত। এই বিল ও আইনের বাস্তব

রূপায়নে সরকার ক্রমে কঠোর হচ্ছেন কিন্তু অসুবিধা হল এর সরাসরি প্রতিফলন হবে দ্রব্যমূল্যতে। চাল, চিনি, সিমেন্ট, কাপড়, বিদ্যুৎ, রান্নার গ্যাস নিত্যপ্রয়োজনীয় সবকিছুরই দাম বাড়বে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যদি কলকাতাকে কেবলমাত্র বাতাসের দূষণ থেকে মুক্ত করতে হয় তাহলে শিল্পে লগ্নী স্থায়ী মূলধনের উপর চাপ পড়বে ৩০% এবং তার রক্ষনাবেক্ষণের জন্য ব্যয় হবে প্রতিবছর ৫%। ফলস্বরূপ শিল্পজাত মূলের উপর প্রভাব হবে ১৫% (এটা সরকারী হিসাব)। তাছাড়া যে সব রাজ্যের শিল্পের মূলধনের বাজার মন্দা (যেমন পশ্চিমবাংলা) তাদের পক্ষে এই ব্যয়ভার বহন হবে বেশ কষ্টসাধ্য। অন্তত শিল্পপতিরা তাই বলেন। তবে যেহেতু দূষণ বন্ধ করতেই হবে তাই এ বিষয়ে গবেষণা করে নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন করে, খরচ কমিয়ে, বা অসম্ভব বলে বেশি খরচ করেই জনস্বার্থে এসব বন্ধ করা উচিত। কারণ এ ছাড়া পথ নেই।

অর্থনৈতিক সঙ্কটের দরুণ সরকার পরিকল্পনার দ্রুত বাস্তব রূপায়নে বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছেন। আজও দেশের শতকরা ৫০ ভাগ লোক দারিদ্র্য সীমার নীচে সুতরাং সরকারের জনপ্রতিনিধিদের সচেতন হতে হবে, ভেবে দেখতে হবে আমদানীকৃত আধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োগে স্বল্পসংখ্যক মানুষের জীবনের উন্নতিই কাম্য নাকি উপযুক্ত প্রযুক্তির সাহায্যে দারিদ্র্য দূরীকরণের প্রয়োজন। বাস্তবে আজপর্যন্ত যে সব পরিকল্পনা হয়েছে তার রূপায়নের জন্য প্রয়োজন হচ্ছে বিপুল অর্থ ভাণ্ডারের যার যোগানদার উন্নত দেশগুলি ও তাদের হাতেরপুতুল বিশ্বসংস্থা। তারা ঋণ দেয় শর্ত সাপেক্ষে। ফলে ঋণের আড়ালে আসছে উচ্চমূল্যে নিম্নমানের প্রযুক্তি এবং তার সহযোগী যন্ত্রাংশ। এই প্রক্রিয়ার অভিশাপ আজ শিল্পের বাজারে সর্বত্র। ঋণের বোঝা কমাবার জন্য বাড়াতেই হচ্ছে রপ্তানি। বেশী করে কাটতে হচ্ছে লোহা, ম্যাঙ্গানিজ, কয়লা ও অভ্রের খনি।

ফলে পর্দার আড়ালে ধ্বংস হচ্ছে দেশের অমূল্য সম্পদ, প্রকৃতি নিঃশেষিত হচ্ছে।

সরকার অবশ্য নানাবিধ কর্মসূচী হাতে নিয়েছেন। শুরু করেছে বনমহোৎসব ও বনসৃজন। বসেছে ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট। গঙ্গার দূষণরোধের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি পাল্লা দিচ্ছে পদযাত্রা পরিক্রমা, সভা, মিছিল, সরকারের অর্থ সাহায্যে গড়ে উঠেছে সংঘ, সংস্থা ও পরিষদ, এদের ভার দেওয়া হচ্ছে পরিবেশ দূষণ রোধ করার। এরা পরিবেশ দূষণের চেহারাটা জানার জন্য করছে সমীক্ষা, নমুনা সংগ্রহ এবং তার পরীক্ষা হচ্ছে। লেখা হচ্ছে প্রতিবেদন। আইনের সাহায্যে খোঁজা হচ্ছে অপরাধী কিন্তু এর মধ্যেই আমরা পেয়ে গেছি ভূপাল। সুতরাং সরকার যতই কোমর বেঁধে আসরে নামুন তা হচ্ছে সিন্ধুতে জবিন্দুবৎ। ভয় কাটেনি, কাটাবার অবস্থাও আসেনি।

সবার ভাবনা

এখন কি করণীয়? মাটি-জল-বায়ু-দূষণ প্রতিরোধ ব্যাপারে আমরা কি করতে পারি তার একটি তালিকা দেওয়া হল।

১। ব্যাপক বৃক্ষরোপণ এবং সংরক্ষণ।

২। জ্বালানী হিসাবে মরা ও শুষ্ক কাঠের ব্যবহার। সেই সঙ্গে বিকল্প জ্বালানীর উদ্ভাবনের চেষ্টা এবং গোবর গ্যাসের ব্যাপক ব্যবহার। ধোঁয়াহীন উনুনের ব্যবহার ও সৌরশক্তিচালিত উনুনের প্রচলন।

৩। কারখানার ফ্লাই এ্যাস এবং নদীবাহিত পলি থেকে ইট তৈরীর ব্যবস্থা।

৪। শহর ও মহানগরীতে আরও বেশী সংখ্যায় উন্মুক্তশ্যামল প্রান্তর ও মহানগরীগুলিকে ঘিরে সবুজবলয়ের সৃষ্টি করা।

৫। সবুজ জৈব ও শৈবাল সারের ব্যাপক প্রচার এবং প্রয়োগ।

৬। সার কিংবা জ্বালানী তৈরীর উৎসরূপে। কঠিন বর্জ্য পদার্থের পুনর্ব্যবহার।

জল

১। আধুনিক উপায়ে স্বাস্থ্যসম্মত পয়ঃপ্রণালীর বিস্তার ও রক্ষণাবেক্ষণ। অশোধিত জলের শোধনের আধুনিক ব্যবস্থা। জলের (বিশেষ করে নলবাহিত) অপচয় এবং অপব্যবহার বন্ধ করার দ্রুত পরিকল্পনা নেওয়া। জলের গুণগতমান ও তার অপচয় বন্ধ করার জন্য জনমাধ্যমের সাহায্য নেওয়া।

২। শিল্পসংস্থা থেকে নির্গত দূষিত জলের শোধন এবং বর্জ্যপদার্থকে পুনর্ব্যবহার করা। নির্গত বর্জ্য পদার্থ থেকে উপজাত পদার্থ তৈরী করে অর্থ আহরণ করা, যাতে শোধনের অর্থ নৈতিক ভার কমে।

৩। ছোট শহর, গ্রামাঞ্চল এবং যারা দারিদ্যসীমার নীচে তাদের জন্য সেপ্‌টিক ট্যাঙ্ক অথবা দুইপাতকুয়াযুক্ত পায়খানার ব্যবস্থা। উন্মুক্ত স্থানে এবং জলশায়ের ধারে মল-মূত্র ত্যাগ করার থেকে জন-সাধারণকে বিরত করা। এর জন্য সুষ্ঠু পরিকল্পনা এবং ব্যাপক গণ মাধ্যমের সাহায্যে প্রচার চালান। সুলভ শৌচালয়ের ব্যাপক প্রচলন এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা।

৪। ২০০০ সালের মধ্যে নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত পানীয় জলের সরবরাহ সকলের জন্য সুনিশ্চিত করা। খরা ও সুখা অঞ্চলে যে সকল গ্রামগুলিকে সরকারী ভাবে 'পানীয় জলহীন গ্রাম' ধরা হয়েছে সেখানে আহরণযোগ্য দূরত্বের মধ্যে (১.৬ কিলো মিটার) পানীয় জলের বন্দোবস্ত করা। Chirayankil

Regional Water supply Scheme, Nattika-kirka, Regional Water Supply Scheme. Salem Hand pump Project ইত্যাদি কর্মসূচীগুলির মত। গ্রামীন বসতির জন্য আরও গঠনমূলক পরিকল্পনা করা, যাতে স্থানীয় জনসাধারণ তাতে সক্রিয় অংশনিতে পারে। এর ফলে তাদের অর্থ নৈতিক উন্নতিও হবে।

৫। ছোট শহর ও গ্রামাঞ্চলে ভূ-পৃষ্ঠের জলের উৎসগুলিকে প্রয়োজনভিত্তিতে চিহ্নিত করা এবং পানীয় জলের উৎস-গুলিকে নিরাপদ করা, যাতে সেইজল অন্য কোন কাজে ব্যবহার না করা হয়। হস্তচালিত চাপাকলগুলির রক্ষণা-বেক্ষণের জন্য স্থানীয় যুবকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া। সস্তা ও সহজলভ্য যন্ত্রাংশের ব্যবহারের বহুল প্রচার।

৬। সহজ ও সরল বৈজ্ঞানিক উপায়ে যে কোন স্থানে জলের গুণগতমানের তাৎক্ষণিক পরীক্ষার বন্দোবস্ত করা এবং জন-সাধারণকে সেই সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেওয়া। প্রয়োজনানুসারে স্বেচ্ছাসেবক দল তৈরী করা। যারা বিভিন্ন স্থানে হাতে কলমে করে দেখাবে।

বাতাস

১। কলকারখানা থেকে নির্গত দূষিত গ্যাস ও ভাসমান কঠিন পদার্থের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ ও শোধন। প্রয়োজন এ জন্য নির্মম ও নিশ্ছিদ্র আইনের।

। পেট্রোল ও ডিজেলচালিতযান থেকে নির্গত গ্যাস ও ভাসমান কঠিন পদার্থের নিয়ন্ত্রণ এবং শোধন। যানবাহনের জটিলতা কমানো ও গতির মন্থরতা দূর করা। দূষণমুক্ত যানবাহনের প্রচলন বাড়ানো। যানবাহনের সংখ্যা কমানো এবং তা জন সংখ্যা ভিত্তিক করা।

৩। গৃহস্থালীতে ধোঁয়াহীন জ্বালানীর ও উন্নতমানের চুল্লীর ব্যবহার।

৪। বাস এবং ভারীমালবাহী ট্রাকগুলিকে ক্রমে ক্রমে, চাপের দ্বারা সংকুচিত তরলীকৃত প্রাকৃতিক জৈব উপাদান থেকে প্রস্তুত গ্যাস দিয়ে চালানো।

৫। হাল্কা, মাঝারী ও ভারী মোটর যানগুলির টিউনিং এবং ফিল্টার ঠিক মতো কাজ করছে কিনা তার নিয়মিত পরীক্ষার ব্যবস্থা করা।

বিবিধ ভাবনা—কয়েকটি প্রস্তাব

১। স্কুলে সর্বত্র ৫ম শ্রেণী থেকে পরিবেশ সম্পর্কিত বিষয়টিকে অবশ্য পাঠ্য করা। এই জন্য কমপক্ষে ৫০ নম্বরের পাঠ্যক্রম নির্দিষ্ট করে রাখা। প্রয়োজনে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

২। জলে-স্থলে অন্তরীক্ষে পরমাণুশক্তির পরীক্ষা বন্ধ করা। এর দ্বারা প্রস্তুত অস্ত্রভাণ্ডারের সম্পূর্ণ বিনাশ। এই শক্তির ব্যবহারের কুফলের প্রভূত প্রচার এবং নতুন পরমাণু প্রকল্প-গুলির রূপায়নে গণতান্ত্রিক উপায়ে বাধাদান।

৩। পৃথিবীর ওজোনের ছাতায় ছিদ্র এবং গ্রীনহাউস এফেক্টের সম্ভাব্য নিরসন নিয়ে গবেষণা।

৪। নতুন বিকল্প শক্তির উৎসগুলিকে ব্যাপক অনুসন্ধান করা এবং তাদের কার্য্যকরী ব্যবহারে গবেষণা করা। যেমন পৃথিবীর বুকের ভেতরে বন্দী যে বিশাল তাপশক্তির ভাণ্ডার আছে, তাকে কাজে লাগান।

৫। ঘুমন্ত সরকারসমূহকে প্রাণপণে সজাগ রাখার চেষ্টা করা। নতুন পরিকল্পনা, শিল্প প্রতিষ্ঠান ও নগর গড়ার আগে এর থেকে পরিবেশ কি ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে না নির্ধারণ করা।

৬। ক্ষতিকারক ও বিষময় রাসায়নিক দ্রব্যের উৎপাদন, রপ্তানি, আমদানী এবং ব্যবহার চিরতরে বন্ধ করা।

৭। পরিবেশ প্রতিশোধনের বিষয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত তরুণ ও তরুণীদের বিভিন্ন কর্মশালার মাধ্যমে কাজ করার সুযোগ দেওয়া যাতে জনগণকে পরিবেশ সচেতনতায় উদ্বুদ্ধ করা যায়।

৮। জননেতা, গ্রামপ্রধান ও স্থানীয় অনুপ্রাণিতদের নিয়ে দ্রুত ফলদায়ী প্রকল্প হাতে নেওয়া এবং অর্থ তহবিল গড়ে তোলা যাতে বাসস্থান, স্বাস্থ্যকর, খাদ্য ও বস্ত্র সুলভে যোগান দেওয়া যায়।

৯। জনসাধারণকে পরিবেশ দূষণের কুফল এবং তার প্রতিকার সম্পর্কে সচেতন করা এবং গণমাধ্যম বা গণপ্রতিষ্ঠানগুলিকে এগিয়ে আনার সুযোগ করে দেওয়া এবং সরকারমুখী না হয়ে স্বেচ্ছাউদ্যোগে অর্থতহবিল গঠন করা। ছবি, নাটক, চিত্রকলা এবং আরো উন্নতমানের কলাগুলির সাহায্যে পরিবেশ দূষণ রোধ এবং সংরক্ষণের চেতনা সৃষ্টি করা। ভ্রাম্যমান দৃশ্য সজ্জা এবং প্রেক্ষাপট সৃষ্টি যাতে স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবকদের সাহায্যে বিপেষ করে গ্রামীণ মানুষের মধ্যে দ্রুত চেতনা আনা যায়।

১০। উন্নততর শিক্ষায় পরিবেশ নিয়ে পঠন-পাঠন এবং গবেষণার সুযোগ আরও বাড়ানো, যাতে সরলীকৃত উপায়ে আরও বেশী সংখ্যক মানুষে খুব কম সময়ের মধ্যে সচেতনতা আনা যায়। সারা দেশ জুড়ে Data Bank এর সৃষ্টি করা যাতে ভাবীকালের সমস্যার চরিত্র সহজেই অনুধাবন করা যায়। ফলে ভবিষ্যতে যদি পরিবেশ বার্ত্তা প্রচারিত হয় আবহাওয়া বার্ত্তার সঙ্গে তার ফল অনেক সুস্বাদু হবে।

১১। 'গাছ লাগান' কে লৌকিক আচারের মধ্যে আনা যা কালক্রমে সংহতি-সাম্য-ভ্রাতৃত্ব-বিশ্বমানবতার প্রতীক হবে।

১২। সর্বোপরি দেশে সাক্ষরতার প্রসার। সব মানুষ যেন নিজে ভালোমন্দ বিচার করতে পারেন, বুঝতে পারেন। শুধুমাত্র অন্যের কথায় যেন নির্ভর না করতে হয় এই অবস্থা সৃষ্টি করা।

উপসংহার

দীর্ঘ ভুল পথ আমরা পেরিয়ে এসেছি। সুতরাং চাই পরিবর্তন। কারণ আমরা বলতে পারিনা যে আমরাই শুধু বেঁচেনি, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কি হল আমাদের যায় আসেনা। এ কথা এমন কি মূর্খের মুখেও শোভা পায়না। তবে পরিবেশ নিয়ে যুদ্ধের জন্য অনেক মানুষ চাই। এমন মানুষ চাই যার মনের ভেতরের অন্ধকার দূর হয়েছে। অনেকে মিলে একযোগে এই যুদ্ধে অংশ-গ্রহণ না করলে এ ব্যাপারে জয়লাভ করা কঠিন।

□

প্রকৃতি ও মানুষ

রঞ্জন রায়

প্রকৃতি, মানুষ ও পরিবেশ

প্রকৃতি ও মানুষ তথা সমাজের পারস্পরিক সম্পর্কের সম্যক ধারণা ছাড়া পরিবেশ অথবা পরিবেশ দূষণ বিষয়ক আলোচনা করা নিরর্থক। কারণ, মানুষ ও প্রকৃতি অঙ্গীভূত, একে অপরের পরিপূরক। তাই উভয়ের সম্পর্কের ভিত্তি আমাদের জানতে হবে। আবার মানুষে মানুষে অনৈক্য দেখা দিলে, একশ্রেণীর মানুষের প্রতি আরেক শ্রেণীর অশ্রদ্ধা, ঘৃণার মনোভাব থাকলে এর প্রতিক্রিয়া প্রকৃতি-মানুষ সম্পর্কের ক্ষেত্রেও প্রতিফলিত হয়। প্রকৃতি ও মানুষ অঙ্গাঙ্গ হওয়াতে আমরা ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখি, যে সমাজব্যবস্থায় মানুষ মানুষকে শোষণ করেছে, কশাঘাত করেছে সেখানেই প্রাকৃতিক ভারসাম্য বিপর্যস্ত হয়েছে। সমস্যার মূলকারণ এইখানেই নিহিত আছে।

পরিবেশ বা প্রকৃতি বিষয়ক ভাবনা চিন্তা প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ করে চলেছে। সভ্যতার উষালগ্নে মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব ছিল না। ভয় আর বিস্ময় ছিল প্রকৃতি বিষয়ে স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া। প্রকৃতি ছিল প্রাচীন গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষের কাছে অগম্য, অলীক ও রহস্যময়। প্রকৃতি অলৌকিকশক্তি হিসাবে প্রতিভাত

হয়েছিল। একটা পর্যায়ে বিশ্বপ্রকৃতি এবং ঈশ্বর এক ও অভিন্ন হয়ে উঠল।

প্রকৃতি ও মানুষের সম্পর্কের অবনতির কারণ

কিন্তু প্রকৃতি-মানুষের নিবিড় সম্পর্কের গ্রন্থি কালক্রমে টুটে-গেল। লোভ, অসূয়া, অসাম্য মানুষের মধ্যে প্রকট হয়ে উঠল। মানুষে মানুষে ভেদাভেদ, বৈরিতার সৃষ্টি হল। শোষনের জাঁতাকলে এক বৃহৎ সংখ্যক মানুষকে এক শ্রেণীর মানুষ দাস বানিয়ে রাখল। মানুষকে ঘৃণা ও অবজ্ঞার মধ্য দিয়ে প্রকৃতিকে অবহেলা ও অবজ্ঞার সূত্রপাত হল। শিল্প, জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চায় সমুজ্জ্বল গ্রীসের সভ্যতা দাসপ্রথার কলঙ্ক বহন করছে। দাসদের প্রতি দাসমালিক তথা অভিজাতবর্গ যে অমানবিক আচরণ করেছিল, প্রকৃতির ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা ছিল লুণ্ঠকের।

ব্যবহারিক জীবনে—পথনির্মাণ, বিচার-বিধি প্রণয়ন ইত্যাদিতে রোমসভ্যতার যে অবদানই থাকুক, প্রকৃতি-মানুষের স্বাভাবিক বন্ধুত্ব-পূর্ণ আদান-প্রদানের সম্পর্ককে রোমানরা গুরুত্ব দেয়নি। সাম্রাজ্য বিস্তার, বর্বরদের আক্রমণ ইত্যাদির ফলে অবশেষে রোমের অর্থনীতি ভেঙে পড়ে এবং আহৃত প্রাকৃতিক ও বনজ সম্পদ নিঃশেষিত হয়ে যায়। এই সময়ের আলোচনা প্রসঙ্গে হেগেল বলেছিলেন যে মানুষ ও প্রকৃতির একতাময় সুসম্পর্ক এবং প্রকৃতির মধ্যে ঈশ্বরকে খুঁজে পাওয়া—এ জাতীয় চিন্তা রোমান জীবনদর্শন থেকে অন্তর্হিত হয়েছিল।

মধ্য যুগে প্রকৃতি চর্চা

রোম সাম্রাজ্য পতনের সময়ে যে নূতন সামাজিক ব্যবস্থা গড়ে উঠল তা হল সামন্ততন্ত্রবাদ। শ্রম বিভাজন গভীরতর হতে লাগল এবং ব্যাপকতর বিনিময় প্রথার মাধ্যমে জাতীয় বাজারের সূচনা

হতে থাকল। প্রকৃতির ক্ষেত্রে নির্দয় দৃষ্টিভঙ্গি অপরিবর্ত্তিত রইল। প্রকৃতপক্ষে মধ্যযুগে প্রকৃতিচর্চা অন্ধকারাচ্ছন্নই থেকেছে। যে দার্শনিক মতবাদ স্কল্যাস্‌টিসিজ্‌ম্ (Scholasticism) নামে পরিচিত, সেখানে প্রকৃতি নিয়ে ভাবনার নামগন্ধ ছিল না। হেগেলের রচনা থেকে জানতে পারি ঐ দর্শন প্রকৃতি নিয়ে পঠন-পাঠন ঘৃণা করত। ঐ দর্শনের যাঁরা প্রবক্তা তাঁরা প্রকৃতিকে ভূমিদাসতুল্য মনে করতেন, যা মানুষের স্বেচ্ছাচারিতার উপকরণ মাত্র।

রেনেশাঁস সময়কালের আলোকছটায় জ্ঞানবিজ্ঞানচর্চার নূতন দিগন্ত উন্মোচিত হলে প্রকৃতি - বিজ্ঞান চর্চা গুরুত্ব পেল। পৃথিবী নতুন করে আবিস্কৃত হতে লাগল। কোপারনিকাস, লিয়োনার্দো দ্য ভিঞ্চি, গ্যালিলিও, ব্রুনো এঁদের বলিষ্ঠ চিন্তাধারা ও আবিষ্কার ধর্মের বাতাবরণ থেকে বিজ্ঞানকে মুক্তি দিল। কিন্তু তথাপি বিজ্ঞানের আপাতঃ ব্যবহারিক বা বস্তুগত দিকটাকেই এই সময়ের দার্শনিকরা অধিক গুরুত্ব দিলেন। ফ্রান্সিস্ বেকন্ এবং দেকার্ত্ বিজ্ঞান চর্চাকে যান্ত্রিক সূত্রের গণ্ডিতে সীমায়িত করলেন। সত্যঅনুসন্ধিৎসার যে ব্যাকুল বাসনা নিয়ে বিজ্ঞানীরা অগ্রণীর ভূমিকা নিলেন প্রকৃতি-মানুষে সাযুজ্য রক্ষার ক্ষেত্রে ঐ তীব্র বিজ্ঞান চেতনা যেন মেঘাচ্ছন্ন হয়ে গেল। নূতন সব আবিষ্কার উৎপাদনের ক্ষেত্রে পুঁজিকে এমন অপ্রতিহত গতি এনে দিল, যা প্রকৃতি ও সমাজের যথার্থ মূল্যায়নে ব্যর্থ হল। কার্ল মার্কস বলেছিলেন পুঁজি-ভিত্তিক উৎপাদন বিশ্বজুড়ে প্রাকৃতিক ও মানবিক সম্পদ শোষনের ব্যবস্থা সৃষ্টি করে। হেগেলের মত তিনিও বিশ্বাস করতেন যে প্রকৃতি ঐ উৎপাদন ব্যবস্থায় শুধুমাত্র একটি বস্তু, একটি প্রয়োজনীয় জিনিস। যুগযুগান্ত ধরে প্রকৃতি ও মানুষে এই যে বিচ্ছিন্নতা, মার্কস যাকে 'alienation' বলেছেন, সেখানেই রয়েছে পরিবেশ সমস্যার মূল কারণ।

শিল্প বিপ্লব ও প্রাকৃতিক ভারসাম্য

শিল্পবিপ্লবের সময় থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত উৎপাদনের ক্ষেত্রে পুঁজিবাদী উৎপাদন-সম্পর্ক উৎপাদনী শক্তির ব্যাপক বৃদ্ধি ঘটালেও প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার ক্ষেত্রে তা নিয়োজিত হয় নি। আর হয়নি বলেই বৃহত্তর মানুষের সুস্থ ও সুন্দর ভাবে বেঁচে থাকার সম্ভাবনা বিনষ্ট হয়েছে।

ঔপনিবেশিকতার প্রভাব

দুশো বছর আগে উত্তর আমেরিকায় শ্বেতকায় মানুষেরা যখন উপনিবেশ স্থাপন করল, তারা যে শুধু অরণ্য ধ্বংস করল তাই নয়, নির্মম ভাবে হত্যা করল বন্যপ্রাণী ও আদিম অধিবাসীদের। তাদের কাছে দাসব্যবসা আর আবলুস (ebony) কাঠের ব্যবসা ছিল সমতুল্য। ঔপন্যাসিক হেমিংওয়ে এক সময়ে বলেছিলেন যে, শ্বেতাঙ্গদের আগমনের ফলেই মহাদেশগুলি বিধ্বস্ত অঞ্চলে পরিণত হল। সমগ্র প্রকৃতি অরণ্যচারী আদিবাসীসহ ঐ শ্বেতাঙ্গ প্রভুদের শীতল উদাসীনতা, নিষ্ঠুর আক্রমণ ও লুণ্ঠনের সামগ্রীতে পরিণত হল।

কবি ওয়াল্ট হুইটম্যানের "লিভস্ অফ্ গ্রাস্" (Leaves of Grass) কাব্যে অনন্য ভাষা, দরদ ও আবেগের সাথে প্রকৃতির কোল থেকে বৃন্তচ্যুত ঐ আদিবাসী, রবীন্দ্রনাথ যাদের নাম দিয়ে ছিলেন 'লাল ভারতীয়', কলকাকলি মুখর অসংখ্য পাখী আর প্রাণীর হারিয়ে যাওয়ার মর্মবেদনার প্রকাশ ঘটেছে। কবির ভাষায়,

"The red aborigines,
Leaving natural breaths, sounds of rain
and winds, calls as of birds
and animals in the woods, syllabled to us
for names,

Okonee, Koosa, Ottawa, Monongahela, Sauk, Natchez,
Chattahoochee, Kaqueta, Oronoco,
Wabash, Miami, Saginaw, Chippewa,
Oshkosh, Walla-Walla,
Leaving such to the States they melt, they depart,
Charging the Water
and the land with names."

ঐ 'সভ্য' দস্যুদের কাছে লাল ভারতীয়দের প্রতিটি মাথার খুলি ও চামড়ার দাম ছিল এই রকম : ১৭০৩ সালে ৪০ পাউণ্ড ; ১৭২০ সালে ১০০ পাউণ্ড ; ১৭৪৪ সালে নয়া মুদ্রায় (new currency) ১০০ পাউণ্ড (১২ বছরের শিশুদের মাথার দামও এক)।

এই রক্ত পিপাসা ও বর্বর লোভকে তৎকালীন বৃটিশ পার্লামেণ্ট ঈশ্বর ও প্রকৃতির অভিপ্রেত জীবিকার উপায় বলে বর্ণনা করল। ঠিক ভাষাটি হচ্ছে, "means that God and Nature had given into its hand"।

এটা সঠিকভাবে প্রতীয়মান্ যে মানুষ ও প্রকৃতির বন্ধুসুলভ, স্নিগ্ধ সম্পর্ককে যারা ধ্বংস করেছে তারা ইতিহাসের বিভিন্ন পর্য্যায় কখনও দাসব্যবসায়ী, কখনও সামন্তপ্রভু, কখনও উপনিবেশপত্তন-কারী কখনও পুঁজিপতি।

মার্কস ও এঙ্গেলস্-এর পরিবেশ চেতনা

সমস্যার এই মূল জায়গায় প্রথম যে দুই মহান্ সমাজবিজ্ঞানী আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তাঁরা হলেন কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিখ এঙ্গেলস্। সমাজ-ইতিহাসের অর্থনৈতিক ও উৎপাদন সম্পর্ক অনু-

ধাবন করে প্রায় দেড়শ বছর আগে তাঁরা তাঁদের বিভিন্ন রচনায় প্রকৃতি ও মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের গভীর ব্যঞ্জনাময় ও বিজ্ঞান-ভিত্তিক যে বিশ্লেষণ উপস্থাপিত করেছিলেন তার মাধ্যমে উক্ত সম্পর্কের অন্তর্নিহিত বন্ধন ও পারস্পরিক আদান-প্রদানের নিবিড় ভিত্তি বিষয়ে আমরা সম্যক ধারণা লাভ করি। মার্কস মনে করতেন ইতিহাসের গতিপথে মানুষ ও প্রকৃতির তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক সম্পর্ককে বিযুক্ত করে চিন্তা করলে ঐতিহাসিক বাস্তবের প্রারম্ভিক জ্ঞানলাভও সম্ভব নয়। কুহেলিকাচ্ছন্ন অন্যান্য দার্শনিক ব্যাখ্যাকে নস্যাৎ করে তাঁরা প্রমাণিত করলেন সমাজের অর্থ নৈতিক চালিকা শক্তির নিরিখে প্রকৃতি-মানুষ সম্পর্কের নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ হয়ে থাকে।

শিল্পবিপ্লবের সময়কাল থেকে ঘূর্ণিঝড়ের মত পুঁজির যে বিকাশ ঘটল তার দুর্দমনীয় ও অবশ্যম্ভাবী প্রভাবে প্রাকৃতিক ভার-সাম্য রক্ষার ক্ষেত্রে চূড়ান্ত অধোগতি ঘটল। "প্রকৃতির শক্তিকে মানুষের কর্তৃত্বাধীন করা, যন্ত্রের ব্যবহার, শিল্প ও কৃষিতে রসায়নের প্রয়োগ, বাষ্পশক্তির সাহায্যে জলযাত্রা, রেলপথ ইলেকট্রিক, টেলিগ্রাফ, চাষবাসের জন্য গোটা একটা মহাদেশ সাফ করে ফেলা………" (Communist Manifesto) ইত্যাদি ক্ষেত্রে বুর্জোয়াশ্রেণী পূর্বেকার সমস্ত উৎপাদন শক্তিকে শত যোজন পিছনে ফেলে সামনে এগিয়ে গেল।

শুধু উত্তর আমেরিকার ক্ষেত্রে নয়, বুর্জোয়া শ্রেণী বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে যেখানেই গিয়েছে, উপনিবেশ স্থাপন করেছে সেখানেই 'ছায়াবৃতা', 'কালো ঘোমটার' নিচে শ্যামলিমার রূপকে নিছক ভোগ্য-পণ্যের মত টেনে হিঁচড়ে বিধ্বস্ত ধ্বংস করেছে।

আজ বিংশশতকের শেষ প্রান্তে প্রায় সমগ্র পরিমণ্ডলই শিল্প দূষণের বিষে জর্জরিত। এঙ্গেলস কিন্তু ১৮৭২ সালে শিল্পের আবর্জনা

ও উচ্ছিষ্ঠ থেকে লণ্ডন ও বার্লিন ও শহর-দূষণের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। লণ্ডন শহর তখন বিষিত। বার্লিন হ'য়ে উঠেছিল পূতিগন্ধময়।

শিল্পোন্নত দেশে দূষণ

দূষণের ক্ষেত্রে বর্ত্তমান বিশ্বের শিল্পে অত্যন্ত উন্নত দু-একটি দেশের আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। পঞ্চাশের দশকের শেষার্দ্ধে জাপানে মিনামাতা উপসাগরের ধারে জেলেদের একটি গ্রামে রাসায়নিক বিষক্রিয়ায় একশ' জনের উপরে লোক মারা যায় এবং কয়েক হাজার লোক গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ে। এই মর্মন্তুদ, ঘটনার পর থেকে ঐ রোগটি 'মিনামাতা' রোগ বলে পরিচিতি হয়।

১৯৬৪ সালে জাপানের হনসু দ্বীপে এগানো নদীর ধারে হঠাৎ দশজন লোক মারা যায়। একটি রাসায়নিক কারখানার আবর্জনা জলকে দূষিত করায় এই দুর্ঘটনা ঘটে। এই নূতন রোগটির নাম 'ইতাই-ইতাই'।

চিকিৎসাশাস্ত্রে এই সব নিত্যনূতন রোগের নাম পাওয়া যাবেনা। শিল্পদূষণ মানুষকে নূতন, নূতন রোগ উপহার দিয়ে চলেছে। ১৯৭১ সালে পশ্চিম জার্মানীর বখাম-গার্থ (Bochum-Gerthe) নামে একটি জায়গায় কারখানার বিষাক্ত জলীয় পদার্থ কয়েক হাজার পিপায় ভরতি করে মাটিতে লুকিয়ে রাখা হয়। এটি ধরা না পড়লে প্রায় আড়াই কোটি লোক বিষক্রিয়ার শিকার হত। ১৯৭৫ সালে পশ্চিম জার্মানীর আরও তিনটি শহরে অনুরূপ ঘটনার কথা জানা যায়।

এর থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থায় মানুষের অস্তিত্ব কিভাবে বিপন্ন হয়ে উঠেছে। দূষিত জল

বা আবর্জনা যা শিল্প কারখানা থেকে নির্গত হচ্ছে তা পরিশোধনের ব্যবস্থা করতেও শিল্প মালিকরা রাজি নন।

শিল্প-দূষণের সব চেয়ে বড় দুর্ঘটনা ঘটে ভারতে। ১৯৮৪ সালের ডিসেম্বর মাসে মধ্যপ্রদেশের ভূপালে ইউনিয়ন কার্বাইড কারখানা থেকে নির্গত বিষাক্ত গ্যাসের ফলে কয়েক হাজার ঘুমন্ত মানুষ মৃত্যুর কোলে ঢোলে পড়ে। ঐ মারণ গ্যাসের প্রভাবে অগণিত মানুষ আজও পঙ্গু এবং মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছে। ১৯৭২ সালে কানাডা সরকারের নোটিশে উঠে যাওয়া কারখানা তৎকালীন ভারত সরকারের অনুমতিক্রমে ভূপালে বসানো হয়। কানাডা সরকার এই কারখানাকে পরিবেশ ও জীবনের পক্ষে বিপজ্জনক ঘোষণা করা সত্ত্বেও কেন্দ্র ও মধ্যপ্রদেশ সরকারের সাথে এই কারখানার বহুজাতিক সংস্থার পরিচালকবৃন্দের অশুভ চুক্তির ফলে আজ ভারতে শতাব্দীর সব চেয়ে ভয়াবহ শিল্পদুর্ঘটনা ঘটে গেল।

বন্যপ্রাণী হত্যা তো নির্বিচারে ঘটেই চলেছে। ১৬০০ থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত তিনশ বছরের অধিককাল সময়ে ৩৬ ধরণের স্তন্যপায়ী প্রাণী এবং ৯৪ ধরণের পাখী পৃথিবী থেকে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়েছে। এ ছাড়া বৃহৎ সংখ্যক পাখী ও প্রাণী নিশ্চিহ্ন হওয়ার পর্য্যায়ে রয়েছে। ১৯৭২ সালের একটি সমীক্ষায় জানা যায় যে ২৩৬ ধরণের স্তন্যপায়ী প্রাণী এবং ২৮৭ ধরণের পাখী পৃথিবী থেকে হারিয়ে যাওয়ার মুখে।

দূষণ সমস্যার সমাধান

পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থায় এই দূষণ সমস্যার কোন সমাধান ঘটতে পারে না। মার্কসের একটি উক্তি এই প্রসঙ্গে অনুধাবন যোগ্য: "আমাদের কালে সব কিছুর মধ্যেই যেন বৈপরীত্য অন্তর্নিহিত

রয়েছে। অদ্ভুত কোন মায়াবীর প্রভাবে নতুন ধরণের সম্পদের সব উৎস অভাব-অনটনের উৎসে পরিণত হয়। মূল্যবোধের বিনিময়ে শৈল্পিক বিজয় কেনা হয়েছে বলে মনে হয়। যে গতিতে মানুষ প্রকৃতিকে জয় করে চলেছে, ঠিক সেই গতিতেই মানুষ অপরের দাসে পর্যবসিত হচ্ছে অথবা নিজের কলঙ্কভাগী হচ্ছে। এমনকি বিজ্ঞানের শুদ্ধ আলোকধারা অজ্ঞতার অন্ধকারকে ভেদ করে আলোক বিকিরণ করতে ব্যর্থ হচ্ছে।" (কার্ল মার্কস, নির্বাচিত রচনাগ্রন্থ, ১ম খণ্ড মস্কো, ১৯৭৮) এই কথাগুলি মার্কস লিখেছিলেন ১৮৫৬ সালে। আজকের বিশ্বে ধনতান্ত্রিক দেশগুলির সৃষ্ট যে পরিবেশ দূষণ সমস্যা মানুষের অস্তিত্বকে সংকটময় করে তুলেছে, এর প্রকৃত কারণ ঐ সমাজের উৎপাদন ব্যবস্থার মধ্যেই লুকিয়ে আছে। মার্কসের এই উক্তির মর্মার্থ আজও বিস্ময়কর ভাবে সত্য।

একমাত্র সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় পুঁজিবাদী সমাজের ব্যক্তিগত মালিকানার পরিবর্তে সামাজিক মালিকানার ভিত্তিতে মানুষে মানুষে যে উৎপাদন সম্পর্ক স্থাপিত হয় সেখানে মতাদর্শগত সম্পর্ক, সমাজচৈতন্য, সংস্কৃতি, পরিবেশ-প্রকৃতি বিষয়ক চিন্তা ইত্যাদি সর্বক্ষেত্রে যে দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হয় তা হল সার্বিক, দ্বন্দ্ববিহীন এবং সংহতিমূলক। সমাজতান্ত্রিক সমাজে বিজ্ঞান ভিত্তিক মননের সাথে প্রকৃতির সাযুজ্য সহজেই গড়ে ওঠে। উৎপাদন প্রক্রিয়া সার্বিক মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত হওয়ায় প্রকৃতির উপযোগিতা ও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক ও লোভাতুর দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তে সুস্থ, জীবনধর্মী দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠে। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় পরিকল্পনা মাফিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে নিয়োজিত করে দূষণমুক্ত শিল্প স্থাপন করা সম্ভব হয় কারণ তীব্র সমাজচেতনা বোধে উক্ত ব্যবস্থায় মানুষ উজ্জীবিত হয়। বর্তমান সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে পরিবেশ সংরক্ষণের (environmental protection) বিষয়টি সাংবিধানিক আইনের অন্তর্গত।

সোভিয়েত ইউনিয়নের সংবিধানের ১৮ নং ধারা (Article 18) লক্ষ্য করা যেতে পারে ঃ

"সোভিয়েত ইউনিয়নে, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বার্থে, ভূমিরক্ষা সহ খনিজ এবং জলের উৎসগুলির এবং সেই সাথে বনজ ও প্রাণী সম্পদের বিজ্ঞানভিত্তিক, যুক্তিসঙ্গত ব্যবহারের ক্ষেত্রে এবং বিশুদ্ধ বাতাস ও জল রক্ষার্থে যথার্থ, সর্বাত্মক ব্যবস্থা গৃহীত হওয়া ছাড়াও, প্রাকৃতিক সম্পদ উৎপাদন ও মানবিক পরিবেশ উন্নয়নে রাষ্ট্রীয় প্রয়াস নিশ্চিত করা হয়েছে।"

ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতেও বর্ত্তমানে পরিবেশ সচেতন মানুষ প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার পক্ষে জোড়ালো গণআন্দোলন গড়ে তুলছেন। এর ফলস্বরূপ ঐ সব দেশের সরকার কিছু কিছু সাময়িক পদক্ষেপ গ্রহণ করা ছাড়াও আন্তর্জাতিক পর্য্যায়ে আলোচনা শুরু করেছেন। মানুষ আজ বুঝেছে যে পরিবেশ বিজ্ঞান (ecology) বলতে শুধুমাত্র কিছু বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বা তত্ত্বসম্বন্ধীয় আলোচনা বোঝায় না। সমাজ ও মানুষের অস্তিত্ব, অবস্থান, অর্থ নৈতিক সম্পর্ক, নন্দন তত্ত্ব, নীতিজ্ঞান ইত্যাদি সব কিছুর সাথে পরিবেশ বিজ্ঞান গভীর ভাবে সম্পৃক্ত।

উপসংহার

প্রকৃতি-মানুষের সম্বন্ধ বিজেতা ও বিজিতের সম্বন্ধ নয়, পারস্পরিক প্রগাঢ় বোঝাপড়া ও সুষমামণ্ডিত বন্ধনই কলুষ ও মলিনতা মুক্ত সৃজনশীল, শাশ্বত শান্তির বাতাবরণ পৃথিবীতে গড়ে তুলতে পারে। এ বিষয়ে এঙ্গেলস্-এর কথা স্মর্তব্য ঃ

"অন্য জাতির দেশ দখলকারী, প্রকৃতির সত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন এক বিজয়ীর মত আমরা কখনই প্রকৃতির উপর প্রভুত্ব করতে পারি না। কারণ আমাদের রক্তমাংসের শরীর, বুদ্ধি, মেধা এই

সব কিছু নিয়েই প্রকৃতির সাথে, প্রকৃতির মাঝে আমাদের অবস্থান। মানুষের বৈশিষ্ট্য এইখানে যে সে প্রকৃতি ও অন্যান্য প্রাণীর নিজস্ব নিয়ম সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করতে পারে এবং তা সঠিক ভাবে প্রয়োগ করতে পারে।" (Dialectics of Nature, Progress Publishers, Moscow, 1974)

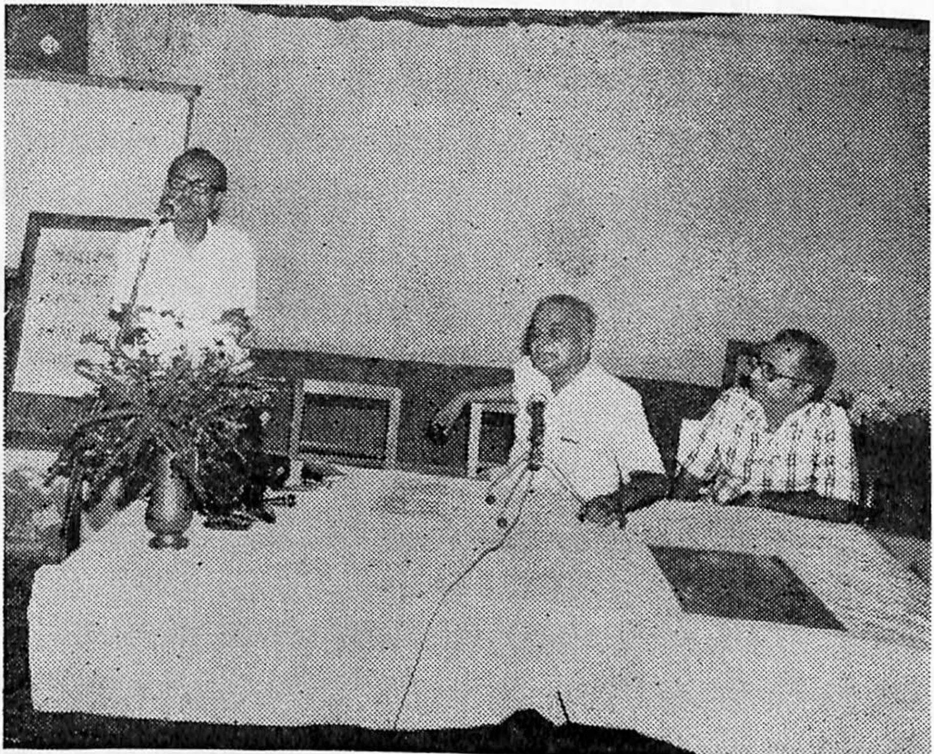
বিষাদ নয়, দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে মানুষ আগামী দিনের প্রতীক্ষায় আছে যে দিন মানুষের সম্মিলিত প্রয়াস ও আন্দোলনের ফলে পৃথিবী তার বৈভব, মহিমা ফিরে পাবে। যারা পৃথিবীর আলো নিবিয়েছে, বাতাস বিষিয়েছে, পৃথিবীকে করেছে রিক্ত, তাদের কি মানুষ ক্ষমা করবে? কবি ওয়াল্ট হুইটম্যানের কবিতা মনে পড়েঃ

"Come, we will make the continent indissoluble,
I will make the most splendid race
the Sun ever shone upon,
I will make divine magnetic lands,
with the love of comrades,
with the life-long love of comrades."

□

কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় পরিবেশ সচেতন কেন্দ্র আয়োজিত সেমিনারে প্রাক্তন উপাচার্য

ডঃ সিতাংশু মুখোপাধ্যায়





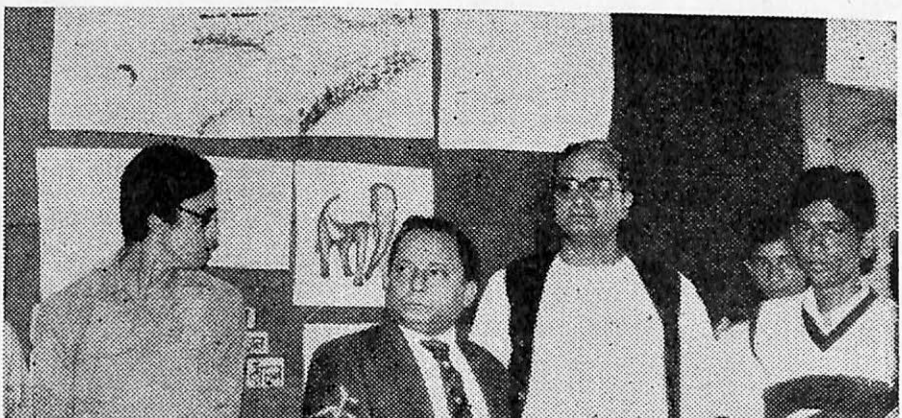
বৃক্ষ রোপণ অনুষ্ঠানে আলোচনা, ১৯৮৯



মাননীয় উপাচার্য কর্তৃক বৃক্ষ রোপণ, ১৯৮৯



চাকদহে সেমিনার, ১৯৮৯



চাকদহ সেমিনারে বিজ্ঞান প্রদর্শনীতে উপাচার্য

কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় পরিবেশ সচেতন কেন্দ্র সম্পর্কে কিছু কথা

উৎপল সরকার

কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ সচেতন কেন্দ্র স্থাপিত হয় ১৯৮২ সালে। তৎকালীন উপাচার্য মাননীয় সিতাংশু মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রেরণায় এবং উৎসাহে বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে পরিবেশ সচেতন কেন্দ্র স্থাপিত হয়। পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় পরিবেশ মন্ত্রী ভবানী মুখোপাধ্যায় ঐ কেন্দ্র আনুষ্ঠানিক ভাবে উদ্বোধন করেন। ঐ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে দাঁড়িয়ে উপাচার্য মহাশয় ঘোষণা করেছিলেন যে এই পরিবেশ সচেতন কেন্দ্র সাধারণ মানুষকে পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন এবং সজাগ করার প্রয়াস চালাবে। কারণ পরিবেশ সম্পর্কে সাধারণ মানুষের ধারণা স্বচ্ছ নয়, যে জন্য মানুষ পরিবেশকে সঠিক ভাবে উপলব্ধি করতে পারে না। এজন্য প্রতিনিয়ত পরিবেশকে নানা ভাবে বিব্রত করছে। অবশ্য পরিবেশ নিয়ে উৎসাহ অতি সম্প্রতি দেখা দিয়েছে। সমাজবিজ্ঞানী থেকে শুরুকরে সমস্ত স্তরের বিজ্ঞানীরা পরিবেশ নিয়ে পঠন-পাঠন এবং গবেষণা করে চলেছেন। তাই সকল স্তরের মানুর পরিবেশ সম্পর্কে জানার আগ্রহবোধ করছে। কারণ সাধারণ মানুষ বুঝতে পারছে পরিবেশ

সম্পর্কে সচেতন না থাকলে পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখা যাবে না। এব্যাপারে সরকারও চুপ করে বসে নেই। তাঁরাও অবস্থা মোকাবিলা করতে দফতর খুলেছেন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিও প্রয়োজনীয় এই বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করে চলেছে। এছাড়াও দেশের স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলিও তাদের সাধ্যমত প্রয়াস চালাচ্ছেন। আমাদের বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষও সময়োচিত চিন্তা ভাবনা করেই পরিবেশ সম্পর্কে কিছু করার তাগিদ বোধ করেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব নিয়ন্ত্রণে 'পরিবেশ সচেতন কেন্দ্র' স্থাপন করেন। বিশ্ববিদ্যালয় পরিবেশ সচেতন কেন্দ্র জন্মলগ্ন থেকেই বিশ্ববিদ্যালয় সম্প্রসারণ শাখার মত এর কাজ করে চলেছেন। ১৯৮২ সালে প্রতিষ্ঠিত হলেও এই কেন্দ্রের জন্য অর্থবরাদ্দ না থাকায় এর কাজ চালাতে বেশ অসুবিধায় পড়তে হয়। তথাপি এই কেন্দ্রের কাজ বসে থাকেনি বরং ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে। ক্রমেক্রমে কেন্দ্র স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হয়েছে। আজ ১৯৮৯ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিবেশ সচেতন কেন্দ্র তার কর্মধারার মধ্য দিয়েই নিজের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে পেরেছে এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এই কেন্দ্রের কর্মধারায় খুশী হয়েই বিশ্ববিদ্যালয়ের বাজেটে পরিবেশ সচেতন কেন্দ্রের জন্য অর্থ বরাদ্দ করেছেন। কেন্দ্র-সম্পাদক হিসাবে এ জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাই। এই প্রসঙ্গে আমার বক্তব্য যে, এই কেন্দ্রকে আরো জনমুখী এবং বাস্তবধর্মী করতে হলে এর কাজের ধারাকে বৃদ্ধি করতে হবে। এ জন্য আরো বেশী অর্থের প্রয়োজন কারণ সাধারণ মানুষকে যদি পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন না করা যায় তবে দেশে আইন করেও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করা সম্ভব নয়। এর জন্য একদিকে জনসাধারণকে পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন করতে হবে অন্যদিকে জনগণের দায়িত্ব এবং কর্তব্যবোধকে জাগিয়ে তুলতে হবে। জানি খুব সহজে বা অল্প সময়ে এই কাজ করা যাবে না।

এই কাজ করার জন্য লাগাতার প্রচার করতে হবে এবং জনগণের পরিবেশ চেতনার মানকে বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করতে হবে।

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিবেশ সচেতন কেন্দ্র ১৯৮৩ সাল থেকেই সাফল্যের সাথে এ কাজ করে চলেছে এবং আমরা বিদ্যালয় পর্যন্ত পরিবেশ চেতনার মানকে উন্নত করার জন্য বিভিন্ন বিদ্যালয়ে গিয়ে সেখানকার ছাত্র/ছাত্রীদের, শিক্ষক/শিক্ষিকাদের নিয়ে আলোচনা চক্রের আয়োজন করেছি। আলোচনাচক্রগুলিকে সফল করে তুলতে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিজ্ঞ শিক্ষক মহাশয়রা ঐ সব আলোচনাচক্রে যোগদান করে মূল্যবান ভাষণ রেখেছেন, এর ফলে আমাদের কেন্দ্রের গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। আমরা তাঁদের জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। কেন্দ্রের সাফল্যের পিছনে এঁদের অবদান বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। আশা করব বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিজ্ঞ শিক্ষকরা আগামী দিনেও এই রকম সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবেন। এই কেন্দ্র সঠিক ভাবে পরিচালনার জন্য একটি পরিচালক সমিতি আছে। ঐ সমিতিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত স্তরের প্রতিনিধিরাই আছেন। মাননীয় উপাচার্য মহাশয় ঐ সমিতির সভাপতি। যখনই যে উপাচার্য এই পদ অলঙ্কৃত করেছেন তিনি বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে এই কেন্দ্র পরিচালনায় পরামর্শ দিয়েছেন এবং এর কর্মসূচীতে অংশ নিয়েছেন। মাননীয় উপাচার্যের সক্রিয় সহযোগিতা আমাদের কেন্দ্রের কাজ পরিচালনায় উৎসাহ জুগিয়েছে। এ ছাড়াও পরিচালন সমিতির অন্যান্য সদস্যরাও কেন্দ্র পরিচালনায় বিভিন্ন ভাবে সাহায্য করেছেন। বর্তমানে যে পুস্তকটি প্রকাশিত হচ্ছে তার জন্যও পরিচালন সমিতির সকল সদস্যই বিশেষ উৎসাহ জুগিয়েছেন। সর্বোপরি যাঁর উৎসাহে এই পুস্তকটি প্রকাশিত হচ্ছে তিনি হলেন মাননীয় উপাচার্য ডঃ কল্যাণ কুমার দাশগুপ্ত। তিনি নিজে একজন পরিচিত ঐতিহাসিক, লেখক এবং কবি। পুস্তক

প্রকাশের পরিকল্পনা থেকে ছাপা হয়ে বেরোন পর্যন্ত তিনি প্রতি মূহূর্তে তাঁর মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করেছেন। এছাড়াও যে সব অভিজ্ঞ এবং স্বনামধন্য শিক্ষক মহাশয়েরা এই পুস্তকটিতে তাদের মূল্যবান লেখা দিয়েছেন এবং পুস্তকটির মান উন্নত করেছেন আমরা সচেতন কেন্দ্রের পক্ষ থেকে তাঁদের সকলকে জানাই অভিনন্দন। অধ্যাপক শ্যামাপদ সেন মহাশয় এই পুস্তকটি সম্পাদনা করতে সম্মত হওয়ায় তাঁকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। অধ্যাপক সুশীলকান্ত কোনার সদাব্যস্ততার মধ্যেও যে ভাবে আমাদের আলোচনাচক্রগুলিতে উপস্থিত থেকেছেন তার জন্য আমরা খুবই কৃতজ্ঞ। তিনি একজন প্রতিষ্ঠিত লেখক, পরিবেশ বিষয়ক আন্তর্জাতিক পত্রিকার সম্পাদক। সর্বোপরি এই পুস্তকটিতে যে বিষয় থাকল তা যদি দেশের মানুষের চেতনার মান উন্নয়নে সামান্যতম সাহায্য করতে পারে তবেই এই পুস্তক প্রকাশ সার্থক হবে। সবশেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাশনা সংস্থাকে ধন্যবাদ জানাই কারণ তাঁদের সহযোগিতা না থাকলে এই পুস্তক প্রকাশ করা সম্ভব হ'ত না।

বিশ্ববিদ্যালয় পরিবেশ সচেতন কেন্দ্র যে যে কাজ ইতিমধ্যেই করেছেন তার কিছু সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হ'ল, কারণ এই কাজের ধারাকে অব্যহত রেখেই সচেতন কেন্দ্র ক্রমেক্রমে বড় হবে এবং এর কাজের পরিধি বাড়াবে। এরফলে বিশ্ববিদ্যালয় তথা সমাজে এই কেন্দ্রের গুরুত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। আমরা ইতিমধ্যেই বিভিন্ন বিদ্যালয়ে আলোচনা চক্রের আয়োজন করেছি। এছাড়াও আমরা প্রতিবছরই বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদ্‌যাপন করে থাকি এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের জমিতে গাছ লাগিয়েছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের জমিতে একটি পুষ্করিণী খননের জন্য পরিকল্পনা দাখিল করেছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ নীতি গত ভাবে আমাদের পুষ্করিণী খননের প্রস্তাব মেনে নিয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সবুজ সংকেত দিলেই আমরা পুষ্করিণী খননের

কাজে হাত দিতে পারি। এই পুষ্করিণী একদিন যেমন পরিবেশ ভারসাম্য রক্ষায় পুষ্করিণীর ভূমিকা অনুধাবনে সাহায্য করবে অন্যদিকে তেমনি অগ্নি নির্বাপনের কাজেও সাহায্য করবে।

সবশেষে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাই কারণ তাঁদের সক্রিয় সহযোগিতা এবং পরামর্শ ছাড়া এই কেন্দ্রের শ্রীবৃদ্ধি হতে পারত না। তাঁরা আরো একটু সহযোগিতার হাত সম্প্রসারিত করুন, তাতে কেন্দ্রের শ্রীবৃদ্ধির সাথে সাথে বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম বাড়বে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে বৃহৎ জগতের সাথে বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পর্ক আরো নিবিড় হবে এবং শিক্ষাব্যবস্থা গণমুখী হয়ে উঠবে।

□

ভ্রমশুদ্ধি পত্র

পৃষ্ঠা	পঙক্তি	পরিবর্তে	পড়ুন
৩	১৬	আছে	আছে।
৪, ৬	২৫,৩	মিথেন মনোকসাইড	মিথেন ও কার্বন মনোকসাইড
৮	৫	১ নং সারণি	— (বিলোপ)
৯	১৯	টন	টনে
১০	৩	হিসাবে	হিসাব
১১	১৫	Mine	Mines
১২	১৩.১৬	৬৮২, ৩৯৯, ৪.৭৭, ৫.১১	৬.৮২, ৩.৯৯, ৬.২৯, ৭.৭৩
১৩	১১, ১২	৩৫.১১, ৮৬৮১	৩৪.৯১, ৮৬.৮১
১৪	৬,৮,১০	৯৮৪, ২৮৫, ৩৮১, ৪৩৩	৯.৮৪, ২.৮৫, ৩.৮১ ৪.৩৩
	১৩	০৮০, ১৬৮,	০.৮০, ১.৬৮
	১৫	২২.১৯	২২.০৯
১৫	৮,১০,১১	১১৯৫, ৩৭৪, ৩৭৫	১১.৯৫, ৩.৭৪, ৩.৭৫
	১২	৩২৯, ৪৩১	৩.২৯, ৪.৩১
	১৩	২৯৮	২.৯৮
	১৪	১৭০, ৩১৬	১.৭০, ৩.১৬
	১৫	০৮৭, ১৯৪	০.৮৭, ১.৯৪
	১৬	……	১০.৪৬
১৯	৯	ধরনের	ধরণের
	১২	ভুতাপ	ভূতাপ
	১৫	উৎসগুলির	উৎসগুলি
	২৩	ভুস্তর	ভূস্তর

পৃষ্ঠা	পঙক্তি	পরিবর্ত্তে	পড়ুন
২১	২২	রক্ষনশীল	রক্ষণশীল
২৩	১৪	শষ্য	শস্য
২৪	২৪	কোন্ কোন্	কোন কোন
২৬	৩	এহ	এই
	১০	ঝরনা	ঝর্ণা
	২৫	যায়ে	যায়
২৭	১	জলশূণ্য	জলশূন্য
	১২	কোটি	কোটি ঘন লিটার
	২৪	যে	— (বিলোপ)
২৮	৬	উন্নতি	উন্নত
২৯	২৩	জলশূণ্য	জলশূন্য
৩০	৪	সেচ নির্ভর	সেচনির্ভর
	১২	পৌঁছায়নি।	পৌঁছায় নি,
	১৮	নলকুপ	নলকূপ
	১৯	জীবানু	জীবাণু
৩২	৮	অভূতপূর্বভাবে।	অভূতপূর্বভাবে,
৩৮	২২	আহ্বান	আহ্বান,
৪০	২৫	অব্বাহিকা	অববাহিকা
৪৪	২৩	খরা প্রধান	খরা-প্রধান
৪৫	১৬	প্রকল্প	প্রকল্প"
	১৯	বনস্থজন।	বনস্থজন
	২৫	বনভূমি	বনভূমিতে
৪৬	৪	হ'ল প্রথমত	হ'ল ঃ প্রথমত,
	৭	রোপন,	রোপণ
		দ্বিতীয়ত	দ্বিতীয়ত,
৪৭	১৯	লক্ষমাত্রায়	লক্ষ্যমাত্রার
	২২	বনাজঙ্গলের	বনজঙ্গলের

পৃষ্ঠা	পঙক্তি	পরিবর্তে	পড়ুন
৫১	৭	দাত্বিয়	দায়িত্ব
৫২	৪	শষ্য	শস্য
	১৪	যে	সে
৫৬	২৩	জলযান	জলযানের
	২৪	বানিজ্যের	বাণিজ্যের
৫৭	৮	স্তর ও	স্তরও
৫৮	৬	কারণে	কারণ
৬০	২১	না	না,
	২৪	করি।	করি !
৬৩	৪	কোলি	কোশি
৬৪	২১	সুপেষ	সুপেয়
		আকার	আকর
	২৫	অমৃতকুণ্ড	অমৃতকুম্ভ
	২৬	কুণ্ড	কুম্ভ
৬৭	১৪	পালিমাটি	পলিমাটি
	২৫	শহরগুলি	শহরগুলিতে
৭৩	১৭	গবেষনা	গবেষণা
৭৪	১৯	জীবাষ্ম	জীবাশ্ম
৭৫	১৩	ব্যক্তিক্রম	ব্যতিক্রম
৭৬	১	পারে।	পারে,
	৬	আকষ্মিক	আকস্মিক
	৯	পদ্বতি	পদ্বতি,
	১৮	বিপদজ্জনক	বিপজ্জনক
	২১	বুনোরামলালের	বুনো রামলালের
৭৭	২	জৈববা	জৈব বা
	১৭	মালদ্বীপ	মাল্‌ডিভ্‌

পৃষ্ঠা	পঙক্তি	পরিবর্তে	পড়ুন
৭৮	২৫	আকশ্মিক	আকস্মিক
৮৩	৩	খুড়ে	খুঁড়ে
৮৪	৮	সম্পদ্	সম্পদ,
	১০	লক্ষনীয়	লক্ষণীয়
৮৬	১	সারণি—১ …	— (বিলোপ)
৮৯	৬	কাকড়	কাঁকড়
	১৬	শষ্য	শস্য
	১৭	বিপর্যপ্ত	বিপর্যস্ত
৯০	১৮	হল	হ'ল।
৯২	১১	বোঝো	বোঝা
৯৪	১৮	করি	কর
৯৭	২	লক্ষনীয়	লক্ষণীয়
১০১	১-২	Tactors	Tractors
১০২	৮	কার্বন	কার্বন,
১০৩	৯	বড় বাজার	বড় বাজার,
১০৫	১০	জীবীকা	জীবিকা
১০৮	১	প্রজন্মে	প্রজন্ম
১১১	২৫	যন্ত্র নির্ম্মিত	যন্ত্র-নির্মিত
১১২	৯	বছর সমূহের	বছরসমূহ
	১৩	জীবনযাত্রা	জীবনযাত্রা,
		আকাঙ্ক্ষা	আকাঙ্ক্ষা,
১১৪	২৩	উৎস	উৎস
১১৫	১৬	পরিমাণ।	পরিমাণ,
	২০	পুবীভূত	পুঞ্জীভূত
	২৩	৩১.৫	৩.১৫
	২৪	৩৪.৯	৩.৪৯

পৃষ্ঠা	পঙক্তি	পরিবর্তে	পড়ুন
১১৭	৪	ফলে	— (বিলোপ)
১১৮	৭	করা	করা,
১১৯	৯	রাসায়ণিক	রাসায়নিক
	২২	প্রাকৃতির	প্রকৃতির
১২০	১১	চাইছেন	চাইছেন,
	২৪	সংবিধানের	সংবিধানের
১২৩	২	উৎসরূপে।	উৎসরূপে
	১৪	দারিদ্যসীমা	দারিদ্র্যসীমা
১২৪	১৬	করা।	করা,
	২২	।	২।
১২৬	৫	উদ্বুদ্ধ	উদ্‌বুদ্ধ
	১৭	বিপেষ	বিশেষ
	২৪	পরিবেশ বার্তা	পরিবেশবার্তা
১২৯	৬	শোষনের	শোষণের
১৩২	১৯-২০	উপনিবেশপত্তনকারী	উপনিবেশপত্তনকারী,
১৩৪	১	বার্লিন ও	বার্লিন
১৩৬	১০	পরিচিতি	পরিচিত
	৮	১৯৭৮)	১৯৭৮)।
	১৮	বিজ্ঞান ভিত্তিক	বিজ্ঞানভিত্তিক
১৩৭	১৬	নন্দন তত্ত্ব	নন্দনতত্ত্ব
		পরিবেশ বিজ্ঞান	পরিবেশবিজ্ঞান
	২৩	সত্তা	সত্ত্বা
১৩৮	৩	জ্বান	জ্ঞান
১৩৯	১৪	মানুর	মানুষ
১৪২	৩	তাদের	তাঁদের

□

"পরিবেশ প্রসঙ্গ—প্রথম খণ্ড" কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় পরিবেশ সচেতন কেন্দ্রের প্রথম প্রকাশন। বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে যুক্ত বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিরা। দ্বিতীয় খণ্ডে অন্যান্য বিষয়ে বহু-বিশেষজ্ঞদের রচনায় সমৃদ্ধ হয়ে অদূর ভবিষ্যতে আত্ম প্রকাশ করবে।